অক্টোবর ২০২৩ ■ আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

বঙ্গবন্ধুর জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ ও তার বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া

১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণতঃ ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

টবে জমা পানি

পরিত্যক্ত বোতল/গামলায় জমা পানি

এডিস মশার লার্ভা

পিউপা

পরিত্যক্ত টায়ারে জমা পানি

পরিত্যক্ত পাত্র

হেমোরেজিক ডেঙ্গু রোগী

এডিস মশার জীবনচক্র

এডিস মশা ডিম পাড়ায় ও বংশবিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়:

- আপনার ঘরে এবং আশেপাশে যে কোন জায়গায় পানি জমতে না দেয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্রিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিস্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারী শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারী ব্যবহার করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

অক্টোবর ২০২৩ ❑ আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩০

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘের মহাসচিব Antonio Guterres-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন– পিআইডি

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধ, স্যাংশন, সংঘাতের পথ পরিহার করে জনগণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্থায়ী শান্তি, মানবাধিকার কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর পাঠকদের জন্য ভাষণটি এ সংখ্যায় তুলে ধরা হলো।

জাতির পিতার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোটো ভাই শেখ রাসেলের জন্মদিন ১৮ই অক্টোবর। পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট কতিপয় বিপথগামী সেনাসদস্য কর্তৃক বঙ্গবন্ধু সপরিবার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। শিশু শেখ রাসেলও সেদিন ঘাতকদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এ সংখ্যায় রাসেলকে নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

১লা অক্টোবর বিশ্ব প্রবীণ দিবস। প্রবীণদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি বার্ধক্যে তাদের যত্নের বিষয়ে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। প্রবীণ দিবস নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

বিশ্ব শিশু দিবস, বিশ্ব খাদ্য দিবস, বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবস, শারদীয় দুর্গাপূজাসহ আরও কয়েকটি বিষয়ে রয়েছে নিবন্ধ। গল্প, কবিতা ছাড়াও নিয়মিত বিভাগ তো রয়েছেই।

আশা রাখছি, অক্টোবর সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

ভাষণ/প্রবন্ধ/নিবন্ধ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে ৪
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

বঙ্গবন্ধুর জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ ও তার বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া ৭
ড. মো. আব্দুস সামাদ

***কারাগারের রোজনামচায়* রাসেল** ১০
অনুপম হায়াৎ

ক্যামেরা আবিষ্কার ও চলচ্চিত্র: চলচ্চিত্র যেভাবে গণমাধ্যম হলো ১২
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

প্রবীণদের জন্য ভালোবাসা ১৫
প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

লাগসই উন্নয়ন ও একজন আখতার হামিদ খান ১৭
ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

সঞ্চয়ের গুরুত্ব ১৯
ড. এন. এইচ. এম. রুবেল মজুমদার

শিশুর মনের যত্ন ২২
খালেদা বেগম

খাদ্য নিরাপত্তা ও বাংলাদেশ ২৫
রেজাউল করিম সিদ্দিকী

প্রথম বাঙালি নারী চিকিৎসক ডা. কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ২৭
ড. মোহাম্মদ আলী খান

মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতার গুরুত্ব ৩১
চয়নিকা সুলতানা

স্বপ্ন বোনার কারিগর শিক্ষক ৩৩
সেলিনা আক্তার

দুর্গাপূজা ৩৫
সুষমা ফাল্গুনী

স্তন ক্যান্সারকে ভয় নয় সচেতন হয়ে জীবন বাঁচাই ৩৭
জেসিকা হোসেন

গল্প

আলোর পাখি ৩৮
মোজাম্মেল হক নিয়োগী

সেদিন ক্লাসে শেখ রাসেলের গল্প বলেছিল সজল ৪০
অমিত কুমার কুণ্ডু

কবিতাগুচ্ছ ৪৩-৪৬
বেগম শামসুন নাহার, বিচিত্র কুমার, জাহানারা জানি, আলমগীর কবির, হাসান হাফিজ, অর্ণব আশিক, দেলওয়ার বিন রশিদ গোপেশচন্দ্র সূত্রধর, রোকসানা গুলশান, বোরহান মাসুদ, আবু জাফর আবদুল্লাহ্, রুস্তম আলী, মনির জামান, সোহেল রানা সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম, এস ডি সুব্রত, নকুল শর্ম্মা

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৭
প্রধানমন্ত্রী ৪৮
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৫০
উন্নয়ন ৫২
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৩
শিক্ষা ৫৪
নারী ৫৫
অর্থনীতি ৫৬
যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক ৫৭
কৃষি ৫৮
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৯
সামাজিক নিরাপত্তা ৬০
চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি ৬১
ক্রীড়া ৬২

শ্রদ্ধাঞ্জলি :

না ফেরার দেশে কবি আসাদ চৌধুরী ৬৩

সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকা ওয়েবসাইট থেকে পিডিএফ পড়তে QR কোডটি স্ক্যান করুন:

ফেসবুক লিংক:
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
E-mail: dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এস.আর. প্রিন্টিং প্রেস লিঃ
৮৫/১ নয়াপল্টন, ঢাকা

হাইলাইটস

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ জনগণের মানবাধিকার রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। তিনি বলেন, জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের আপামর জনগণের মানবাধিকার সংরক্ষণে সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। ২২শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদর দপ্তর নিউইয়র্কে সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন, যুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞা পরিহার, জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য আঞ্চলিক খাদ্য ব্যাংক চালু, জলবায়ু পরিবর্তন, মানবাধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্যসেবা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি), সন্ত্রাসবাদ এবং সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অন্যান্য বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক সমস্যার কথা তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণটি দেখুন পৃষ্ঠা-৪

১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস

১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন শেখ রাসেল। তার পিতা বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় লেখক খ্যাতিমান দার্শনিক ও নোবেল বিজয়ী ব্যক্তিত্ব বার্ট্রান্ড রাসেলের নামানুসারে পরিবারের এই নতুন সদস্যের নাম রাখেন 'রাসেল'। রাসেল ছিলেন পরিবারের সবার চেয়ে ছোটো এবং অতি আদরের। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সপরিবার শহিদ হন। শেখ রাসেলও এদিন নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। ১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস। শেখ রাসেলকে নিয়ে *কারাগারের রোজনামচায়* রাসেল শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা-১০

বঙ্গবন্ধুর জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ ও তার বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টির ফলে ১৯৭৪ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে বাংলাদেশ। এর মাত্র ৮ দিন পর ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ২৯তম অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বাংলায় এক যুগান্তকারী ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণটি ছিল বিশ্বের অধিকার বঞ্চিত, নির্যাতিত এবং নিষ্পেষিত মানুষের ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠার ও বিশ্বশান্তির জন্য বলিষ্ঠ উচ্চারণ ও সাহসী পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও মুক্তিসংগ্রামে সমর্থনকারী দেশ ও জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ছিল শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মিলিত সংগ্রাম।' তিনি জাতিসংঘের মহান আদর্শ, শান্তি ও ন্যায়বিচারের বাণীর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বাংলার লাখো শহিদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণপূর্বক বিশ্বশান্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত উদ্যোগের আহ্বান জানান। তিনি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধুর তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ, গুরুত্ব ও বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে 'বঙ্গবন্ধুর জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ ও তার বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা-৭

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

২২শে সেপ্টেম্বর ২০২৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

Honorable President, I am reading out the shorter version of my main speech due to time constraint. The original speech has been tabled outside. Thank you very much with your permission.

মাননীয় সভাপতি,

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ণ।

আমি আজকে এখানে আমার ১৯তম ভাষণ সাধারণ অধিবেশনে দিতে এসেছি। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় মাননীয় সভাপতি আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। আমি আশ্বাস দিচ্ছি সাধারণ পরিষদে সভাপতির দায়িত্ব পালনকালে পুরো অধিবেশনজুড়েই বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল আপনাকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা দিয়ে যাবে। আমি আপনার পূর্বসূরি জনাব সাবা কোরেশিকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই দক্ষতার সঙ্গে ৭৭তম অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য। বহুপাক্ষিক কূটনীতিকে জোরদারকরণ, জাতিসংঘের ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করার জন্য প্রচেষ্টা ও সাহসী বক্তব্য এবং বৈশ্বিক সংকট উত্তরণে সুদূরপ্রসারী ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমি জাতিসংঘ মহাসচিব জনাব অ্যান্তোনিও গুতেরেসকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি। এই সন্ধিক্ষণে বৈশ্বিক সংহতি রক্ষার্থে আস্থার পুনর্নির্মাণ এবং পুনর্জীবিত করার ক্ষেত্রে আপনার আহ্বান আমাকে এই পরিষদে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭৪ সালের ভাষণের একটি বিশেষ উক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

তিনি বলেছিলেন, 'সাম্প্রতিককালে গোটা বিশ্বে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে আমাদের আরো তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে আমাদের মধ্যে মানবিক ঐক্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধের পুনর্জাগরণ, পারস্পরিক নির্ভরশীলতার স্বীকৃতিই কেবল বর্তমান সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধান ঘটাতে সক্ষম। বর্তমান দুর্যোগ কাটাতে হলে অবিলম্বে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা দরকার'। এ প্রসঙ্গে আগামী বছর Summit of the Future আহ্বান করার উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আশা করছি, এই প্রক্রিয়াটি ২০৩০ উন্নয়ন কর্মসূচি অর্জনের জন্য আমাদের প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

মাননীয় সভাপতি,

২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর আমরা বাংলাদেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হতে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে পেরেছি। আমরা দারিদ্র্যের হার ২০০৬ সালের ৪১.৫ থেকে ২০২২ সালে ১৮.৭ শতাংশে এবং চরম দারিদ্রের হার ২৫.১ শতাংশ থেকে ৫.৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে পেরেছি। অসহায় নারী, বিধবা, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ এবং সমাজের অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারিত করেছি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুবিধা পাচ্ছেন। চলতি বছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে প্রায় ১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

এ বছর আমরা সার্বজনীন পেনশন স্কিমও চালু করেছি। ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সি যে-কোনো নাগরিক এই পেনশন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং অন্যান্য দুর্বল খাতে লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণ ও প্রত্যাশা পূরণে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা নারী শিক্ষাসহ সার্বিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হচ্ছে। প্রাথমিক হতে উচ্চশিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি ৫৩ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি, বৃত্তি ও এককালীন অনুদান দেওয়া হচ্ছে, এদের অর্ধেকেরও বেশি নারী।

মাননীয় সভাপতি,

বৈশ্বিক কার্বন নির্গমনে ০.৪৭ শতাংশেরও কম অবদান রাখলেও বাংলাদেশ জলবায়ুজনিত ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য মারাত্মকভাবে হুমকিস্বরূপ। আমরা জলবায়ু অভিযোজনের জন্য ২০০৯ সালে 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড' প্রতিষ্ঠা করেছি। আমাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে এই তহবিলে এই পর্যন্ত ৪৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করেছি। ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের জন্য আমার সরকারের যুগান্তকারী উদ্যোগ আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় এই পর্যন্ত প্রায় ৮ লাখ ৪০ হাজার পরিবারের ৫০ লাখ মানুষকে বিনামূল্যে জমি ও ঘর বিতরণ করা হয়েছে।

মাননীয় সভাপতি,

উন্নত দেশগুলোকে অবশ্যই ১০০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশে উন্নয়ন চাহিদার কথা বিবেচনা করতে হবে। আমরা ২৭তম জলবায়ু সম্মেলনে গৃহীত ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত তহবিলের জরুরি বাস্তবায়ন চাই। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা, লবণাক্ততা, নদী ক্ষয়, বন্যা ও ক্ষরাজনিত কারণে জলবায়ু অভিবাসীদের দায়িত্ব ভাগাভাগির ক্ষেত্রে আমি আন্তর্জাতিক সংহতির আহ্বান জানাচ্ছি। বিগত কয়েক বছরের আন্তঃসংযুক্ত সংকটগুলো বিশ্বব্যাপী খাদ্য, জ্বালানি ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করেছে যা বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। আমরা প্রতিটি মানুষের জন্য খাদ্য নিশ্চিত করেছি। নিম্ন আয়ের এক কোটি মানুষকে সাশ্রয়ী দামে চাল ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

২০২২ সালে গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপ গঠন এবং এর মাধ্যমে বৈশ্বিক খাদ্য শক্তি এবং অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে বিভিন্নমুখী সমাধান প্রদানের জন্য আমি জাতিসংঘ মহাসচিবকে বিশেষভাবে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন যে, ব্ল্যাক সি গ্রেইন ইনিশিয়েটিভ অকার্যকর হয়ে পড়েছে এবং এ ব্যবস্থার দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি। এছাড়াও আমাদের মতো দেশগুলোর জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। Vision–2041-এর আওতায় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমার সরকার বিপুল বিনিয়োগ করেছে এবং এর মাধ্যমে আমরা আমাদের দেশকে এমন একটি উচ্চ আয়ের দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশে পরিণত করতে চাই যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার এবং নিত্য নতুন উদ্ভাবনের পথ উন্মুক্ত করবে।

মাননীয় সভাপতি,

বাংলাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছি। বাংলাদেশের এই সাফল্য এই সাধারণ পরিষদ দ্বারা স্বীকৃত এবং প্রশংসিত হয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সমুদ্রসীমার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পর সুনীল অর্থনীতি বাংলাদেশের উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারকে কাজে লাগানোর জন্য সমুদ্রের আইন সম্পর্কিত জাতিসংঘ কনভেনশনের বিধানগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন একান্তভাবে আবশ্যক। একদিন আগেই আমি জাতিসংঘের সাগর সম্পর্কিত আইন অনুযায়ী দেশসমূহের জাতীয় অধিকারভুক্ত এলাকার বাইরে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহারের জন্য বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি অব এরিয়ার্স বিয়ন্ড ন্যাশনাল জুরিসডিকশন-বিবিএনজে চুক্তি স্বাক্ষর করেছি।

মাননীয় সভাপতি,

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আমাদের অবদান বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারেরই বহিঃপ্রকাশ। অদ্যাবধি ১ লাখ ৮৮ হাজার বাংলাদেশি নারী ও পুরুষ ৪০টি দেশের ৫৫টি শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করছে। জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনে নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা সংঘাত-পরবর্তী পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় কাজ করে যাচ্ছি। জাতিসংঘের প্রতিরোধ কর্মসূচি বাস্তবায়নে জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের কার্যক্রমকে আমরা পুরোপুরি সমর্থন করি।

মাননীয় সভাপতি,

আমরা বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ এবং তৎসংশ্লিষ্ট হুমকি নিয়ে চিন্তিত, যা প্রতিনিয়ত তথ্যের অপব্যবহার এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার

করে নতুনভাবে আবির্ভূত হচ্ছে। আমার সরকার চরমপন্থা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন যে-কোনো কর্মকাণ্ড গর্হিত অপরাধ। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করে। জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে আমরা সারা বিশ্বের আপামর জনগণের মানবাধিকার সংরক্ষণের অন্যান্য সদস্যগণের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি। আজ এই অধিবেশনে আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করতে চাই যে, বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে যাবে।

মাননীয় সভাপতি,

এ বছর ফিলিস্তিনের ওপর বিপর্যয় নিয়ে আসা নাকবা-এর ৭৫ বছর পূর্ণ হলো। ফিলিস্তিনের জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের পাশে সবসময় আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। মিয়ানমার থেকে জোড়পূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যুত হওয়ার ৬ বছর পূর্ণ হয়েছে। সম্পূর্ণ মানবিক কারণে আমরা অস্থায়ীভাবে তাদের আশ্রয় দিয়েছি। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরে যেতে চায়। সেখানে তারা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে আগ্রহী। আসুন আমরা এই নিঃস্ব মানুষদের তাদের নিজের দেশে ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করি।

মাননীয় সভাপতি,

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট আমার পিতা, জাতির পিতা, বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই দিন আমার মা, আমার ছোটো তিন ভাই, দুই ভ্রাতৃবধূ, চাচাসহ পরিবারের মোট ১৮ জন সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। আমার ছোটো বোন এবং আমি বিদেশে ছিলাম। তাই বেঁচে গিয়েছিলাম এই বর্বরতা থেকে। এর আগে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের ৩০ লক্ষ দেশবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। দুই লাখ নারী নির্মমভাবে নির্যাতনের শিকার হয়।

আমি নিজে নিপীড়িত এবং যুদ্ধ ও হত্যার নৃশংসতার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যুদ্ধ, হত্যা, অভ্যুত্থান ও সংঘাতের ভয়াবহতার কারণে মানুষ যে বেদনা ও যন্ত্রণা সহ্য করে তা অনুভব করতে পারি। তাই আজ আপনাদের সকলের কাছে, বিশ্ব নেতাদের কাছে আমার আবেদন, আসুন যুদ্ধ, স্যাংশন, সংঘাতের পথ পরিহার করি এবং আমাদের জনগণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্থায়ী শান্তি, মানবজাতির কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করি। আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
খোদা হাফেজ।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা পদক পেলেন নৌবাহিনীর ১৯৯ সদস্য

দক্ষিণ সুদানের জুবাতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশ নৌবাহিনী ফোর্স মেরিন ইউনিট-এর ১৯৯ জন সদস্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা পদকে ভূষিত হয়েছেন। ১২ই সেপ্টেম্বর দেশটির রাজধানী জুবাতে ইউনাইটেড নেশনস মিশন ইন সাউথ সুদান (আনমিস)-এর ফোর্স কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহান সুব্রামানিয়াম শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নৌবাহিনীর ১৯৯ জন কর্মকর্তা ও নাবিককে এই মেডেল পরিয়ে দেন।

শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যদের ভূয়সী প্রশংসা করে লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহান সুব্রামানিয়াম বলেন, নীল নদের প্রতিকূল পরিবেশ এবং সংঘাতপূর্ণ এলাকায় অত্যন্ত সাহসিকতা এবং দক্ষতার সঙ্গে অপারেশন পরিচালনার মাধ্যমে জাতিসংঘের জ্বালানি, খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পণ্যসমূহ পরিবহণে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কন্টিনজেন্ট অসামান্য অবদান রাখছেন।

এছাড়াও বাংলাদেশ নৌবাহিনী কন্টিনজেন্ট নদী পথে নিয়মিত টহল পরিচালনা, রেকি অপারেশন, উদ্ধার অভিযান, ডাইভিং অপারেশন এবং দক্ষিণ সুদানে নিয়োজিত জাতিসংঘের সকল সংস্থাকে নদী পথে পরিবহণ ও নিরাপত্তা প্রদানের মতো গুরু দায়িত্ব প্রশংসাজনকভাবে পালন করছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের জন্য তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রচেষ্টায় ২০১৫ সাল থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কন্টিনজেন্ট দক্ষিণ সুদানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে আসছে। দক্ষিণ সুদানে আনমিস-এর একমাত্র মেরিন ফোর্স হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফোর্স মেরিন ইউনিট নীল নদের বিস্তৃত অঞ্চলে জাতিসংঘের ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী কন্টিনজেন্ট নীল নদের দীর্ঘ ১৩০০ কিলোমিটার লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে ৫০টি লজিস্টিক অপারেশনস (অপারেশন লাইফ লাইন) সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। মোতায়েনের পর থেকেই বাংলাদেশ নৌবাহিনী কন্টিনজেন্ট দক্ষিণ সুদান সরকার এবং জনগণের উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রেখে আসছে।

প্রতিবেদন: প্রণব দেব

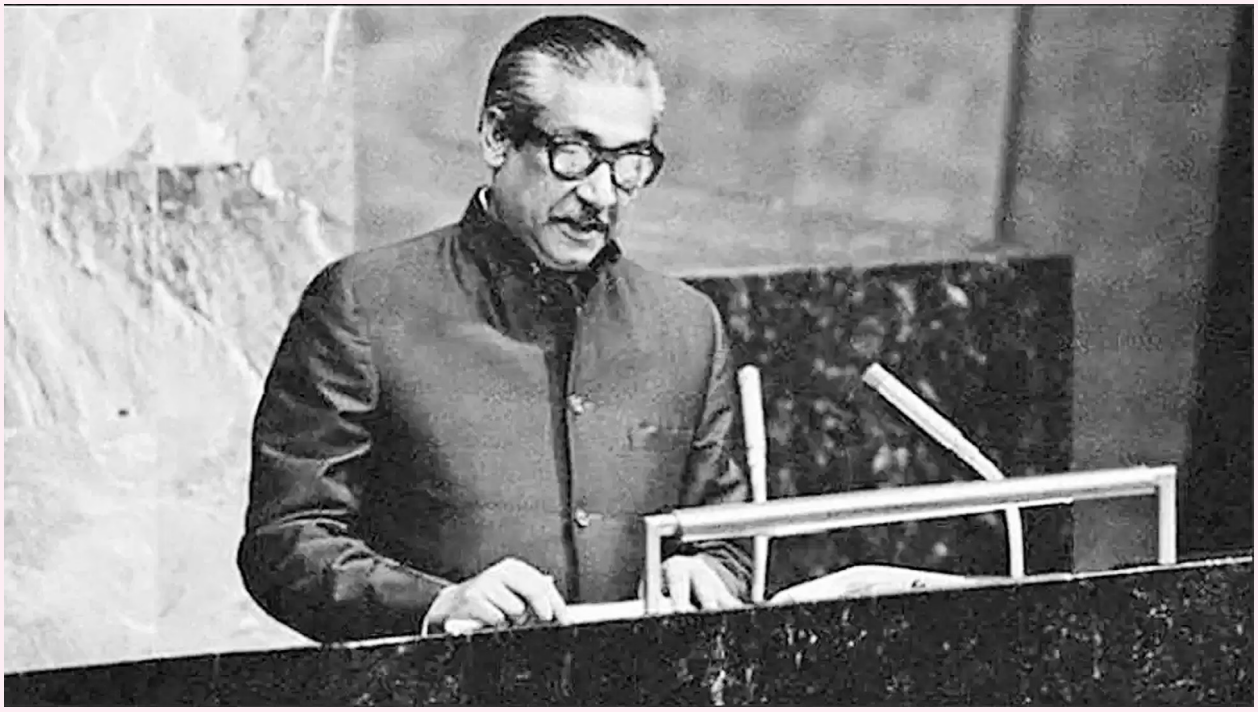

বঙ্গবন্ধুর জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ ও তার বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া

ড. মো. আব্দুস সামাদ

১৯৭৪ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে বাংলাদেশ। এই অর্জন মূলত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টির ফসল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এটি বড়ো সাফল্য। বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি ও সদস্যপদ অর্জনে জাতির পিতার নিরলস কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ও সাফল্যগাথা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এর মাত্র ৮ দিন পর ২৫শে সেপ্টেম্বর তৈরি হয় আরও একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ২৯তম অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বাংলায় এক যুগান্তকারী ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণটি ছিল বিশ্বের অধিকার বঞ্চিত, নির্যাতিত এবং নিষ্পেষিত মানুষের ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠার ও বিশ্বশান্তির জন্য বলিষ্ঠ উচ্চারণ ও সাহসী পদক্ষেপ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বব্যাপী একজন মুক্তিসংগ্রামী ও মহান রাজনীতিবিদ হিসেবেই সমধিক পরিচিত। প্রকৃত প্রস্তাবেই তিনি রাজনীতির মানুষ, রাজনীতিই ছিল তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান। তিনিই বাঙালির শ্রেষ্ঠতম জাতীয়তাবাদী নেতা। বাঙালির সম্মিলিত চেতনায় জাতীয়তাবোধ সঞ্চারে তিনি পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। বিশ্ব ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর মতো জাতীয়তাবাদী নেতার দৃষ্টান্ত বিরল। তিনিই একমাত্র নেতা, যিনি জাতীয় পুঁজির আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা এবং বাঙালির সম্মিলিত মুক্তির বাসনাকে মেলাতে পেরেছেন অভিন্ন মোহনায়। বিশ্ব ইতিহাসে কোনো জাতীয়তাবাদী নেতার কর্মসাধনায় এই যুগলস্রোতের মিলন লক্ষ করা যায় না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উৎসর্গ করেছেন নিজের জীবন।

তবে কেবল রাজনৈতিক ও অথনৈতিক মুক্তিই নয়, বাংলাদেশের ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম নেতা হিসেবেও বঙ্গবন্ধু পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। বস্তুত তাঁর সাধনার মধ্য দিয়েই ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের পূর্ণাঙ্গ ভিত্তি রচিত হয়েছে। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন ভাষা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। সন্দেহ নেই, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের চেতনা এক্ষেত্রে তরুণ শেখ মুজিবকে প্রভাবিত করেছে সবচেয়ে বেশি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করতে ভালোবাসতেন বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা থেকেই তিনি বাংলায় বক্তৃতা করতেন। ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের আট মাস পরে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর প্রতিনিধিদের শান্তি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু অংশগ্রহণ করেন। সেই শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষায় বক্তব্য দেন, যা ইংরেজি, চীনা, রুশ ও স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করে উপস্থিত প্রতিনিধিদের শোনানো হয়। এ ভাষণ নিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে লিখেছেন:

> আমি বাংলায় বক্তৃতা করলাম। কেন বাংলায় বক্তৃতা করব না? পূর্ব বাংলার ছাত্ররা জীবন দিয়েছে মাতৃভাষার জন্য। বাংলা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু লোকের ভাষা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে না জানে এমন শিক্ষিত লোক চীন কেন দুনিয়ায় অন্যান্য দেশেও আমি খুব কম দেখেছি। আমি ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে পারি। তবু আমার মাতৃভাষায় বলা কর্তব্য।

বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা বঙ্গবন্ধুর জীবনের উত্তরকালেও ছিল গভীরভাবে প্রবহমান। এরই ধারাবাহিকতায় ৫০ বছর আগে ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষায় বক্তব্য দিয়ে বিশ্ববাসীকে অবাক করে দেন। আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারি বুমেদিন বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়ে ইংরেজি ভাষায় বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসায় অটল বঙ্গবন্ধু সেদিন বাংলা ভাষায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এই ঘটনা বাংলা ভাষার বিশ্বায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকীকরণে বঙ্গবন্ধুর এই দুঃসাহসী ভূমিকা সম্পর্কে অনেকেই সদর্থক মূল্যায়ন করেন। প্রসঙ্গত, সাংবাদিক আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী লিখেছেন :

> রবীন্দ্রনাথ যেমন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়ে বাঙালির আন্তর্জাতিক কালচারাল নেশনহুডের ভিত্তি তৈরির সূচনা করেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান তেমনি জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়ে সেই নেশনহুডের রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার স্বীকৃতি আদায় করেছেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও মুক্তিসংগ্রামে সমর্থনকারী দেশ ও জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ছিল শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মিলিত সংগ্রাম। তিনি জাতিসংঘের মহান আদর্শ, শান্তি ও ন্যায়বিচারের বাণীর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বাংলার লাখো শহিদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণপূর্বক বিশ্বশান্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত উদ্যোগের আহ্বান জানান। জাতির পিতা তাঁর ভাষণে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার লাখ লাখ মুক্তিকামী মানুষের লড়াই ও ত্যাগের উদাহরণ টেনে বলেন, অন্যায় এখনও চলছে এবং বর্ণবাদও পূর্ণমাত্রায় বিলুপ্ত হয়নি। জনগণের ন্যায়সংগত অধিকার ও বর্ণবাদের অবসান ঘটাতে নতুন বিশ্বব্যবস্থার আহ্বান জানান তিনি। তিনি ফিলিস্তিন, জিম্বাবুয়ে এবং নামিবিয়ার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও মুক্তিসংগ্রামের কথাও বলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তব্যে একদিকে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন অন্যদিকে ক্ষুধায় আক্রান্ত দেশগুলোর জন্য জরুরি সহায়তার কথাও বলেছেন।

তিনি অর্থনৈতিক মুক্তি দিয়ে প্রতিটি মানুষের জন্য সুখী ও শ্রদ্ধাশীল জীবনের গ্যারান্টির তাগিদও দিয়েছেন। অনাহার, দারিদ্র্য ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধভাবে ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান। যে ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্বের সব সম্পদ ও প্রযুক্তি জ্ঞানের ন্যায়সংগত বণ্টনের মাধ্যমে একটি জাতির কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হবে যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি সুখী ও সম্মানজনক জীবনের ন্যূনতম গ্যারান্টি পাবে। জাতিসংঘের অধিবেশনে তাঁর ভাষণে বঙ্গবন্ধু বিশ্বব্যাপী শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অঙ্গীকারের কথা জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করেন। বাঙালির সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সন্তান শেখ মুজিব ১৯৭৪-এর ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে পিনপতন নীরবতার মধ্যে তার স্বভাবসুলভ সাবলীল ভাষায় দৃপ্তকণ্ঠে প্রথমেই বলেন:

> আজ এই মহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সঙ্গে আমি এই জন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির অংশীদার যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এই পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙালি জাতির জন্য ইহা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়া বাঁচার জন্য বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহারা বিশ্বের সব জাতির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়া বাস করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে– আমাদের লাখ লাখ মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য একটি বিশ্ব গড়িয়া তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমাদের এই অঙ্গীকারের সহিত শহীদানের বিদেহী আত্মাও মিলিত হইবেন। ইহা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন সক্রিয় যোদ্ধা সভাপতি থাকাকালেই বাংলাদেশকে এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেয়া হইয়াছে।

কেবল নিজের দেশ নয়, বরং গোটা বিশ্বের শান্তি ও উন্নয়নের স্বপ্ন দেখতেন বঙ্গবন্ধু। আগামী দিনের চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেন,

> আজিকার দিনে বিশ্বের জাতিগুলো কোন পথ বাছিয়া নিবে তাহা লইয়া সংকটে পড়িয়াছে। এই পথ বাছিয়া নেওয়ার বিবেচনার ওপর নির্ভর করিবে আমরা সামগ্রিক ধ্বংস, ভীতি এবং আণবিক যুদ্ধের হুমকি নিয়া এবং ক্ষুধা, বেকার ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে মানবিক দুর্গতিকে বিপুলভাবে বাড়াইয়া তুলিয়া আগাইয়া যাইব অথবা আমরা এমন এক বিশ্ব গড়িয়া তোলার পথে আগাইয়া যাইব যে বিশ্বে মানুষের সৃজনশীলতা এবং আমাদের বিজ্ঞান ও কারিগরি অগ্রগতি আণবিক যুদ্ধের হুমকিমুক্ত উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের রূপায়ণ সম্ভব করিয়া তুলিবে এবং যে কারিগরি বিদ্যা ও সম্পদের পারস্পরিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে সুন্দর জীবন গড়িয়া তোলার অবস্থা সৃষ্টি করিবে। যে অর্থনৈতিক উত্তেজনা সম্প্রতি সমগ্র বিশ্বকে নাড়া দিয়াছে তাহা একটি ন্যায়সংগত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া জরুরিভাবে মোকাবিলা করিতে হইবে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে ধ্বংসলীলার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'সাম্প্রতিক বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।' বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের অঙ্গীকার প্রমাণের জন্য উপমহাদেশে আপোষ মীমাংসার পদ্ধতিকে আমরা জোরদার করেছি।' পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণের জন্য যেসব পদক্ষেপ ও উদ্যোগ নেওয়া

হয়েছে, সেসব কথাও তিনি উল্লেখ করেন। বলেন, 'আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশের অভ্যুদয় বস্তুতপক্ষে এই উপমহাদেশে শান্তির কাঠামো এবং স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অবদান রাখবে।'

ভাষণে বঙ্গবন্ধু বিশ্বশান্তি ও উন্নতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাই জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ পথরেখা নির্দেশ করে বলেন,

> একটি যথার্থ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘকে এর আগে কোথাও এই ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে হয় নাই।...একটি স্থায়ী এবং যথার্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য বিশ্বের দেশগুলির সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কাঠামো প্রণয়নেরও ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। এই মুহূর্তে আমরা প্রত্যেক মানুষের জন্য মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণায় স্বীকৃত মুক্তভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধা ভোগের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার আন্তর্জাতিক দায়িত্বের কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে পুনরুল্লেখ করিতেছি। আন্তর্জাতিক ঘোষণা অনুযায়ী প্রত্যেকটি মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবারের কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

এ উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন এভাবে:

> আমাদের লক্ষ্য স্বনির্ভরতা। আমাদের পথ হইতেছে জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও যৌথ প্রচেষ্টা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যার শরিকানা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস করিবে এবং আমাদের কর্মকাণ্ডকেও সহজতর করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। আমাদের নিজেদের শক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস রাখিতে হইবে। আর লক্ষ্য পূরণ এবং সুন্দর ভাবীকালের জন্য আমাদের নিজেদেরকে গড়িয়া তুলিবার জন্য জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে আমরা আগাইয়া যাইব।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। অসীম সাহসী ও দৃঢ়চেতা বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণের বিরাট অংশজুড়ে একদিকে ফ্যাসিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী এবং বর্ণবাদীদের প্রতি সাবধানতার কথা বলেছেন, অন্যদিকে শোষিত মানুষের অধিকার ও মুক্তির কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি জীবনকে ভালোবাসি তবে আমি মানুষের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করতে ভয় পাই না।' বঙ্গবন্ধু জনগণের অধিকার কেড়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী ব্যবহারের তীব্র নিন্দা জানান এবং বাংলাদেশসহ আলজেরিয়া এবং ভিয়েতনামের নাম উল্লেখ করে বলেন, এ দেশগুলো অপশক্তির বিরুদ্ধে বিরাট বিজয় অর্জন করেছে। তিনি বলেন, 'চূড়ান্ত বিজয়ের ইতিহাস জনগণের পক্ষেই থাকে'। তিনি সব ন্যায়সংগত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং মুক্তিসংগ্রামের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেন। মানবিকতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত প্রয়াস গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তিনি রপ্তানিকারক ধনী দেশগুলোকে মোকাবিলায় গরিব দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাগিদও প্রদান করেন।

সবশেষে বঙ্গবন্ধু বলেন,

> জনাব সভাপতি, মানুষের অজয় শক্তির প্রতি বিশ্বাস, মানুষের অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা এবং অজেয়কে জয় করার শক্তির প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস রেখে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করিতেছি। আমরা দুঃখ ভোগ করিতে পারি, কিন্তু মরিব না। টিকে থাকার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে জনগণের দৃঢ়তাই চরম শক্তি। আমাদের স্বনির্ভরতা।

জাতিসংঘে ২৫শে সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুর সেদিনের ভাষণটি ছিল আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ভাষণ। সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ এবং বর্ণবাদের বিরুদ্ধে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন দেশের নেতা হয়ে বঙ্গবন্ধু দরাজ কণ্ঠে দৃঢ়তার সঙ্গে যে আবেগময় ভাষণ দিয়েছিলেন সবাই তার প্রশংসা করেছেন। জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ড হেইম তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় আমি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত। এ ঐতিহাসিক সম্মেলনে সমাগত অতিথিরা এবং জাতিসংঘের ডেলিগেট বুলেটিন বঙ্গবন্ধুকে কিংবদন্তি নায়ক বলে আখ্যায়িত করে। ১৯৭৪ সালের বিরাজমান স্নায়ুযুদ্ধ ও উত্তর-দক্ষিণ বিরাজমান পরিস্থিতি এবং বিশ্বে পরাশক্তির চলমান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অসীম সাহস নিয়ে ২৫শে সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু জোরালো কণ্ঠে বিশ্বের মেহনতি নির্যাতিত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বঞ্চিত মানুষের পক্ষে এ ভাষণ প্রদান করেন। বিশ্বশান্তি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘকে আরও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশের আহ্বান জানান। জাতির পিতার পথ অনুসরণ করে বঙ্গবন্ধুকন্যা জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়েছেন। জাতিসংঘের পরিবেশ, শান্তিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সব সেক্টরে বাংলাদেশ অনন্য ভূমিকা রাখছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ আজ প্রথম স্থানে।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২৫শে সেপ্টেম্বর এ দিবসটি আজ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক স্টেট (অঙ্গরাজ্য)-এ অভিবাসী দিবস (বাংলাদেশি ইমিগ্র্যান্ট ডে) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুর বাংলায় প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ আমাদের গর্বের ও ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে থাকবে চিরদিন। জাতিসংঘে বাংলাদেশের সরকারপ্রধান হিসেবে প্রথমবারের মতো বাংলায় ভাষণ দিয়ে বঙ্গবন্ধু এক যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। ১৯৭৪ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৩৬তম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুর মাতৃভাষা বাংলায় প্রদত্ত প্রজ্ঞাময় ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালি জাতিকে পৃথিবীতে এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্ত লিখেছেন:

> বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়ে আমাদের ভাষার মর্যাদাকে বিশ্ব রাষ্ট্রসভায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দুর্ভাগ্য আমাদের এবং আমাদের লজ্জা এখানেই যে আমরা সেদিন এর গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে চাইনি।

ড. মো. আব্দুস সামাদ: সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, abdus.samad.history@gmail.com

কারাগারের রোজনামচায় রাসেল

অনুপম হায়াৎ

কুসুমিত কান্নার নাম

বাংলাদেশের ইতিহাসে শেখ রাসেল এক শোকমথিত, বেদনাসিক্ত, কান্নামিশ্রিত হৃদয়-জর্জরিত নাম। ইতিহাসের জঘন্যতম বর্বরতার শিকার, নিষ্পাপ শিশু শেখ রাসেল (১৯৬৪-১৯৭৫)।

শেখ রাসেল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছার কনিষ্ঠ পুত্র, শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, শেখ কামাল ও শেখ জামালের আদরের ভাই। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোর রাতে শিশু শেখ রাসেল পিতা-মাতা, ভাই কামাল-জামাল, ভাতৃবধূ সুলতানা ও রোজীর সাথে ঘাতকদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। একই রাতে নিহত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর ভাই, ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত, ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যবর্গ। সেই হত্যাকাণ্ড, সেই শোক ইতিহাসের অমলিন কালো অধ্যায়।

শেখ রাসেলের জন্ম ১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর। সেটি ছিল এক উত্তাল সময়। উপমহাদেশজুড়ে চলছিল তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ডামাডোল। বঙ্গবন্ধু ছিলেন তখন রাজনীতির মধ্যমণি, প্রত্যাশার সূর্য। ঠিক এমন পরিবেশে বঙ্গবন্ধুর ঘর আলো করে জন্ম নেয় কনিষ্ঠ পুত্র সন্তান। কী নাম রাখা হবে শেখ পরিবারের এই নবজাতকের! বঙ্গবন্ধুর প্রিয় লেখক ছিলেন প্রখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল। অতএব, স্বামী-স্ত্রী মিলে নবজাতক পুত্র সন্তানের নাম রাখেন রাসেল– অর্থাৎ বংশীয় পদবি যোগ করে হলো শেখ রাসেল। দিনে দিনে রাসেল বড়ো হয়। সেই সঙ্গে বড়ো হয় বাঙালিদের ন্যায্য দাবিও। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা। পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে জেলে পাঠান। শিশু রাসেল মায়ের কোলজুড়ে ভাইবোনদের সাথে আব্বাকে দেখতে যায় জেলখানায় একবার নয়, বহুবার।

ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণার পর দেড় বছরের বেশি বয়সি রাসেল বার বার বঞ্চিত হয়েছে পিতার স্নেহময় সান্নিধ্য থেকে। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি ছিল তার ক্ষুদ্র জীবনের সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি ও খুশির দিন। সেদিন তার পিতা ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এসেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশে। সেই থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত রাসেল ছিল পিতা-মাতার পরম স্নেহ-মমতার সান্নিধ্যে।

শেখ রাসেল সম্পর্কে বেদনা ও মধুময় স্মৃতিমূলক উল্লেখ পাওয়া যায় বঙ্গবন্ধু রচিত *কারাগারের রোজনামচা* (২০১৭), শেখ হাসিনা রচিত *আমাদের ছোট রাসেল সোনা* (২০১৯) গ্রন্থে এবং বিভিন্ন জনের বর্ণনায়।

জেলখানাই আব্বার বাড়ি

কারাগারের রোজনামচা (২০১৭) গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু অন্তত ৩০ বার উল্লেখ করেছেন পুত্র রাসেলের নাম। রাসেলের জন্ম ১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর আর ছয় দফা ঘোষণার কারণে বঙ্গবন্ধুকে রাজবন্দি হিসেবে জেলে নেওয়া হয় ১৯৬৬ সালের ৭ই মে। নানা মামলায় তাঁকে আটক রাখা হয়। ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে শিশুপুত্র রাসেল ও অন্যান্যকে নিয়ে বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা জেলে গিয়ে মাঝে মধ্যে দেখা করতেন বঙ্গবন্ধুর সাথে। অবশ্য এতে সরকারি অনুমোদন নিতে হতো।

১৯৬৬ সালের ৯ই জুন *কারাগারের রোজনামচায়* বঙ্গবন্ধু লিখেছেন যে, 'বেগম সাহেবরা (শেখ ফজিলাতুন নেছা) ছেলেমেয়েসহ জেলে তাঁর সাথে দেখা করেন। সাক্ষাৎকারে ছোট ছেলেটি (রাসেল) পূর্বের মতোই 'আব্বা, আব্বা' বলে চিৎকার করে উঠলো। আমি তাকে কোলে নিলাম, আদর করলাম'। (পৃ. ৭৬)

১৮ মাসের শিশু রাসেল আব্বাকে (শেখ মুজিব) বাড়িতে দেখতে পেত না। তাঁর সাথে কেবল দেখা হতো জেলখানায়। তাই রাসেলের ধারণা হয়েছিল যে, 'জেলখানাই আব্বার বাড়ি'। ১৯৬৭ সালের ১৫ই জুন *কারাগারের রোজনামচায়* লিখেছেন বঙ্গবন্ধু:

> ১৮ মাসের রাসেল জেলখানায় এসে একটুও হাসে না– যে পর্যন্ত আমাকে না দেখে। দেখলাম, পূর্বের মতোই 'আব্বা, আব্বা' বলে চিৎকার করে। জেলগেট দিয়ে একটা মাল বোঝাই ট্রাক ঢুকেছিল। আমি তাই জানালায় দাঁড়াইয়া ওকে আদর করলাম। একটু পরেই ভিতরে যেতেই রাসেল আমার গলা ধরে হেসে দিল। ওরা বলল, আমি না আসা পর্যন্ত শুধু জানালার দিকে চেয়ে থাকে; বলে 'আব্বার বাড়ি'। এখন ওর ধারণা হয়েছে এটা ওর আব্বার বাড়ি। (পৃ. ৯৩)

১৯৬৬ সালের ১২ই জুলাই বঙ্গবন্ধু লিখেছেন যে, বেগম মুজিব সন্তানসহ জেলখানায় তাঁর সাথে দেখা করেন। সাথে রাসেলও ছিল। তিনি লিখেছেন, 'গেট পার হয়েও রাসেল হাত তুলে আমার

কাছ থেকে বিদায় নিল। বোধ হয় বুঝে নিয়েছে এটা ওর বাবার বাড়ি, জীবনভর এখানেই থাকবে।' (পৃ. ১৫৯)

একই মাসের ২৬শে জুলাই তিনি লিখেছেন, 'দূর থেকেই ছোট বাচ্চাটা 'আব্বা আব্বা' ডাকতে শুরু করে। এইটাই আমাকে বেশি আঘাত করে'। (পৃ. ১৮১)

মা-কেই 'আব্বা' বলে ডাকে

পিতা জেলে বন্দি থাকার কারণে শিশু রাসেল তাঁকে সবসময় কাছে পায় না। তাই সে মা ফজিলাতুন নেছাকেই 'আব্বা' বলে ডাকে। এই তীব্র বেদনাবোধ বিধৃত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ১৯৬৭ সালের ১৪-১৫ই এপ্রিল লিখিত *কারাগারের রোজনামচায়*:

> জেলগেটে যখন উপস্থিত হলাম তখন ছোট ছেলেটা আর বাইরে এসে দাঁড়ায় নাই দেখে একটু আশ্চর্যই হলাম। আমি তখন রডের ভিতর থেকে ওকে কোলে ধরলাম, আমার গলা ধরে 'আব্বা' 'আব্বা' করে কয়েকবার ডাক দিয়ে ওর মা'র কোলে যেয়ে 'আব্বা' 'আব্বা' করে ডাকতে শুরু করল। ওর মাকে 'আব্বা' বলে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি? ওর মা বললো, "বাড়িতে 'আব্বা' 'আব্বা' করে কাঁদে– তাই ওকে বলেছি, 'আমাকে আব্বা' বলে ডাকতে।" রাসেল 'আব্বা' 'আব্বা' বলে ডাকতে লাগলো। যেই আমি জবাব দেই সেই ওর মা-র গলা ধরে বলে, 'তুমি আমার আব্বা'। আমার উপর অভিমান করেছে বলে মনে হয়। এখন আর বিদায়ের সময় আমাকে নিয়ে যেতে চায় না। (পৃ. ২২১)

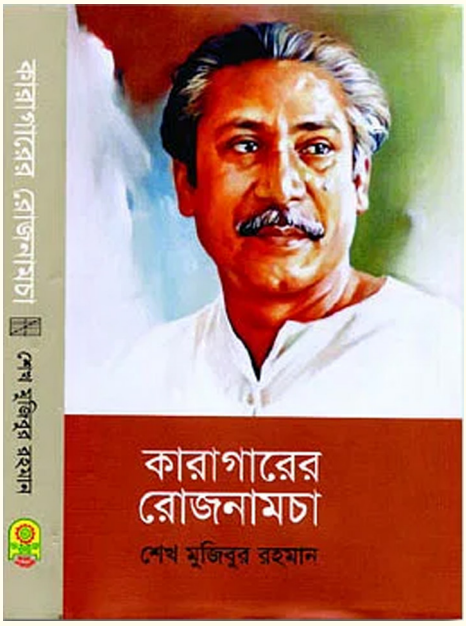

ছয় দফা মানতে হবে, সংগ্রাম চলবে

শেখ রাসেলও কী রাজনীতির বরপুত্র ছিল? বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা ও সংগ্রাম চালিয়ে নেওয়ার স্লোগান অতি অল্প বয়সেই তার মুখে উচ্চারিত হতো। ১৯৬৭ সালের ২৭-২৮শে মে লিখিত *কারাগারের রোজনামচায়* বঙ্গবন্ধুর লেখা থেকে তা-ই জানা যায়। লিখেছেন বঙ্গবন্ধু:

> ... রেণু (শেখ ফজিলাতুন নেছা) এসেছে ছেলেমেয়েদের নিয়ে। ... রাসেল আমাকে পড়ে শোনালো, আড়াই বৎসরের ছেলে আমাকে বলছে, '৬ দফা মানতে হবে– সংগ্রাম, সংগ্রাম চলবে ...। জিজ্ঞাসা করলাম 'ও শিখলো কোথা থেকে?' রেণু বললো, বাসায় সভা হয়েছে, তখন কর্মীরা বলেছিল তাই শিখেছে। বললাম, 'আব্বা, আর তোমাদের দরকার নাই এই পথের! তোমার আব্বাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক'। (পৃ. ২৪৬-২৪৭)

পিতার সুরভিত সান্নিধ্যে

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পর থেকে পিতার সান্নিধ্য পেতে থাকে শিশু রাসেল। রাষ্ট্রীয় শত ব্যস্ততার মাঝেও বঙ্গবন্ধু তাঁর শিশুপুত্র রাসেলকে সঙ্গ দিতেন এবং তাঁকে কাছে কাছে রাখতেন। বিভিন্ন ছবিতে রাসেলকে পিতার সাথে দেখা যায়। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে, বিদেশি অতিথিদের সাথে, ইন্দিরা গান্ধীর সাথে, কেনেডির সাথে, জাপান সফরের সময়, ঈদের জামাতে পরিবারের সদস্যদের সাথে পিতা শেখ মুজিবসহ রাসেলকে দেখা যায়। অনেকেই প্রশ্ন করত, এই শিশুপুত্রটি কেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকে? বঙ্গবন্ধু বলতেন, শিশুটি জ্ঞান হওয়ার পর থেকে বাবাকে কাছে পায়নি। তাই এখন একটু বড়ো হয়ে বাবার কাছে কাছে থাকতে চায়।

আমি মা-র কাছে যাবো

শিশু রাসেলের শেষ আবদার ছিল মা-র কাছে যাওয়ার। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোর রাতে পিতা শেখ মুজিবুর রহমান, মা শেখ ফজিলাতুন নেছা ও ভাই শেখ কামাল ও অন্যান্যকে ঘাতকরা হত্যা করে। গোলাগুলির শব্দ শুনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ভয়ে সে বাড়ির একজন কর্মচারীকে জড়িয়ে বলতে থাকে, 'আমি মা-র কাছে যাবো, মা-র কাছে যাবো'। তখন ঘাতকরা তাকে ধরে নিয়ে যেতে যেতে বলে, 'চল তোকে মা-র কাছে নিয়ে যাই'। অতঃপর রাসেলকে তারা মা শেখ ফজিলাতুন নেছার লাশের কাছে নিয়ে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে।

শেষ কথা

শেখ রাসেল এক কুসুমিত কান্নার নাম। পিতা-মাতা-ভাই ও অন্যান্যদের সাথে তার মৃত্যু ঘটলেও নানা লেখায়, বর্ণনায়, গল্প-ছড়া-গান-নাটক-চলচ্চিত্রে আছে তার নাম। রাসেল এখন সন্ত্রাস-সংঘাত-নৃশংসতায় নিহত প্রতীকী এক নাম।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখায় ফুটে উঠেছে সেই শোকার্ত উচ্চারণ। তিনি লিখেছেন *আমাদের ছোট রাসেল সোনা* গ্রন্থে:

> ১৯৭৫ সালের পনেরো আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেট কেড়ে নিল ছোট্ট রাসেলকে। মা, বাবা, দুই ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী, চাচা সবার লাশের পাশ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে সবার শেষে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল রাসেলকে। ওই ছোট্ট বুকটা কি তখন ব্যথায় কষ্টে বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। যাদের সান্নিধ্যে স্নেহ-আদরে হেসে খেলে বড় হয়েছে তাদের নিথর দেহগুলো পড়ে থাকতে দেখে ওর মনের কী অবস্থা হয়েছিল– কী কষ্টই না ও পেয়েছিল– কেন কেন কেন? আমার রাসেলকে এত কষ্ট দিয়ে কেড়ে নিল? আমি কি কোনোদিন এই 'কেন'র উত্তর পাবো? (পৃ. ৪১)।

অনুপম হায়াৎ: প্রাবন্ধিক, শিক্ষক ও গবেষক

ক্যামেরার আবিষ্কার ও চলচ্চিত্র

স. ম. গোলাম কিবরিয়া

[পূর্ব প্রকাশের পর]

চলচ্চিত্র যেভাবে গণমাধ্যম হলো

চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজন প্রক্ষেপণ যন্ত্র। ১৮৯৫ সালের অক্টোবর মাসে প্যারিসে কিনেটোস্কোপ দেখলেন লুই লুমিয়ের (*Louis Lumiere: 1864-1948*)। তিনি ছিলেন ফটোগ্রাফি ব্যাবসার সাথে জড়িত। চলচ্চিত্রকে পর্দায় আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তিনি। এগিয়ে এলেন তাঁর ভাই অগাস্ট লুমিয়ের (*Auguste Lumiere: 1862-1954*)। লুমিয়েররা প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে সবিরাম গতির প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্তে আসতে

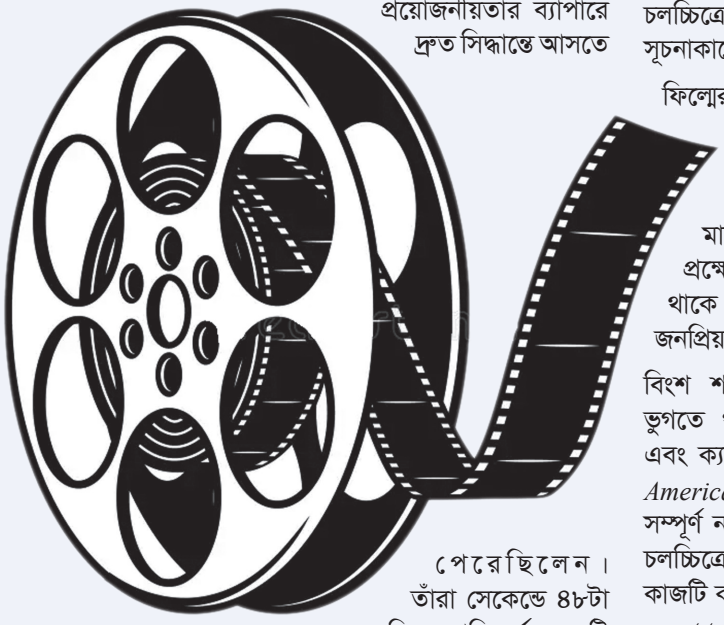

পেরেছিলেন। তাঁরা সেকেন্ডে ৪৮টা ছবির পরিবর্তে ১০টি ছবি প্রক্ষেপণের চেষ্টা করেন। কিন্তু দেখা গেল এতে ছবির গতি মন্থর হয়ে যায়। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন সেকেন্ডে ১৬টি ছবি প্রক্ষেপণ করার। ১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লুমিয়েররা প্রক্ষেপণ যন্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হলেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারি এই যন্ত্রের পেটেন্ট পেলেন। এই ক্যামেরা প্রজেক্টরের নাম দেওয়া হলো 'সিনেমাটোগ্রাফ' (*Cinematograph*)। এরপর ছবি তোলা শুরু করলেন লুমিয়েররা। বাড়ির বাগানে বসে স্ত্রী ও বাচ্চাদের নিয়ে অগাস্ট খাচ্ছেন, এমন দৃশ্যের ছবি তুললেন লুই। *Le Repas de Bede* নামে এ ছবি প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা পায়। ১৮৯৫ সালের ২২শে মার্চ প্রথম দেখানো হলো তাঁদের ছবি। এ বছরের ১০ই জুন ফরাসি ফটোগ্রাফি সোসাইটিতে (*Corgres de l'union Nationale des Societies Photographiques de France*) ব্যবসায়িকভাবে সিনেমাটোগ্রাফের প্রদর্শন শুরু হয়। ২৮শে ডিসেম্বর ১৮৯৫ সালে গ্রান্ড ক্যাফেতে (*Salon Indien, Grand Cafe', Boulevard des Capucines*) জনসাধারণ এক ফ্রাঁয়ের বিনিময়ে দেখতে পেলেন লুমিয়েরদের সিনেমাটোগ্রাফের ছবি। সেদিনের প্রদর্শন করা ছবিগুলো ছিল- ১. *La Sorlie de l'usine LUMIERE alyon*, ২. *La Voltige*, ৩. *La peche aux possions Rouges*, ৪. *La Debarquement du Congres de photograpie a Lyon*, ৫. *Les Forgerons*, ৬. *Les Jardinier*, ৭. *Le Repas*, ৮. *Le Sant a la Couverture*, ৯. *La place des cordeliers a lyon*, ১০. *La Mer* চলচ্চিত্রগুলো পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি করল এক অনন্য ইতিহাস। এসব খণ্ড খণ্ড চলচ্চিত্র নিয়ে লুমিয়ের ভাতৃদ্বয় দেশে দেশে প্রদর্শন করে বেড়াতে থাকলেন। তাঁদের ধারণা ছিল এ বিষয়ে খুব বেশিদিন দর্শকের আগ্রহ ধরে রাখা যাবে না। ফলে যত দ্রুত সম্ভব ব্যাবসা করে নিতে হবে। লুমিয়েররা যেসকল চলচ্চিত্র প্রদর্শন করলেন তা নিছক কিছু ছোটো ছোটো ঘটনার জীবন্ত চিত্রের প্রক্ষেপণ মাত্র। পৃথিবীর প্রথম চলচ্চিত্র হিসেবে বলা হয়ে থাকে *Arrival of a train* ছবির কথা। এটি ছিল মাত্র এক মিনিটের চলচ্চিত্র, যা লুমিয়ের ভাতৃদ্বয়ই প্রদর্শন করেন। তাঁরাই মূলত চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক রূপ দান করেন, যা ঘটেছিল চলচ্চিত্রের সূচনাকালেই।

ফিল্মের বয়স যখন তিন বছর এবং পর্দার বয়স মাত্র দুই বছর, তখন এলো *Passion Play*। লুমিয়েরদের আমেরিকার প্রতিনিধি হার্ড (*W.B. Hard*) *Eden Musee*-এর নির্মাণকাজ শুরু করেন এবং ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে তা শেষ হয়। এভাবে পর্দায় জীবন্ত প্রক্ষেপণের বিষয় ধীরে ধীরে চলচ্চিত্রের দিকে মোড় নিতে থাকে। উল্লেখ্য, *Passion Play* ছবিটি সে সময়ে দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চলচ্চিত্র বৈচিত্র্যতার অভাবে ভুগতে থাকে। ১৯০২ সালে হোয়াইট (*James A. White*) এবং ক্যামেরাম্যান পোর্টার মিলে তৈরি করেন *The life of an American tireman*। চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুতে চমক দেখা গেল। সম্পূর্ণ না হলেও একটা নির্দিষ্ট গল্প বলার চেষ্টা করা হলো এই চলচ্চিত্রে। এ ছবির সাফল্যের পরই পোর্টার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজটি করেন। তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন মঞ্চসফল নাটক *The great train robbery*-কে চিত্রায়িত করার। তাঁর প্রচেষ্টায় আগের চেয়ে অনেক বেশি মার্জিত হলো এর চিত্রনাট্য। চলচ্চিত্রটি প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা পায়।

চলচ্চিত্রের ইতিহাসে গ্রিফিথ এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন *The Birth of a Nation* নির্মাণ করে। চলচ্চিত্রটির প্রথম নাম দেন *Clansman*। ১৯১৪ সালে এর নির্মাণকাজ শেষ করেন। সমস্যা দেখা দেয় প্রদর্শনের। প্যারামাউন্টের সাথে কথা বলে কোনো লাভ হলো না। সেখানে পোর্টারের পরিচালনায় প্রায় এক লক্ষ ডলার ব্যয়ে নির্মাণ হচ্ছিল *The Eternal City*। গ্রিফিথের বর্ণবৈষম্যভিত্তিক ছবির সাথে প্যারামাউন্ট জড়িত হতে চাইলেন না। তখন গ্রিফিথই তৈরি করলেন Epoch Film Corporation। লস এঞ্জেলসের 'Clune's Auditorium'-এ ১৯১৫ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি রাতে ১২রিলের *Clansman*-এর প্রথম প্রদর্শনী হলো। দর্শকরা পেলেন এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। বিস্ময়ে হতবাক হন সবাই। চলচ্চিত্রের ক্ষমতায় শঙ্কিত হন রাজনৈতিক নেতারা। পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়া হয় সম্ভাব্য দাঙ্গার আশঙ্কায়।

এরপর হোয়াইট হাউসে এ ছবি দেখেন প্রেসিডেন্ট উইলসন। সঙ্গে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরা এবং মন্ত্রিবর্গ। ছবি দেখে প্রেসিডেন্ট মন্তব্য করেন, 'It is like writing history in lightning'।

১৯১৫ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি রাতে নিউইয়র্কের রোজ গার্ডেনে ছবিটি দেখলেন লেখক ভিক্সন। তিনি গ্রিফিথকে বললেন ছবির বলিষ্ঠ বাচনভঙ্গির পক্ষে *Clansman* নামটা বেমানান লাগছে। এ ছবির নাম হোক— *The Birth of a Nation*। তারপর চলচ্চিত্রটির নাম বদলিয়ে রাখা হয় *The Birth of a Nation*।

একই বছরের ৩রা মার্চ নিউইয়র্কের Liberty Theatre-এ নতুন নামে *The Birth of a Nation* জনসাধারণের সামনে মুক্তি পায়। এ যাবৎকালে নির্মিত সকল চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা ম্লান করে দেয় *The Birth of a Nation*। এমনকি নয় বছর পর ১৯২৪ সালের প্রথম দিকে যখন শিকাগোর Auditorium Theatre-এ ছবিটি দেখানো হয় তখন যে পরিমাণ অর্থের টিকিট বিক্রি হয় তা ছিল ঐ প্রেক্ষাগৃহের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

এত জনপ্রিয়তার পরও *The Birth of a Nation* আমেরিকার চলচ্চিত্র ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত ছবি হিসেবে গণ্য হলো। ঝড় উঠল সামাজিক এবং রাজনৈতিক জগতে। সেন্সর সমস্যা, রাজনৈতিক নেতাদের ছবির বিরুদ্ধে মামলা ইত্যাদি তো হলোই, *New Republic* কাগজে *Francis Hackett* উপন্যাসের লেখককে ব্যক্তিগত আক্রমণ পর্যন্ত চালালেন। Oswald Garrison Villard লিখলেন— 'a deliberate-attempt to humiliate 10,000,000 American citizens and portray them as nothing but beasts'। দেশটির 'National Associating for the Advancement of Coloured People' ছবির বিরুদ্ধে প্রচার পুস্তিকা বিতরণ শুরু করল।

গ্রিফিথও সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে। সমস্ত অভিযোগের উত্তরে তাঁর বক্তব্য ছিল শিল্পের অধিকার... 'to show the dark side to wrong, that we may illuminate the bright side of virtue'। বাস্তবিক অর্থেই *The Birth of a Nation*-এর একটি দৃশ্যে এই কথা লিখিত ছিল 'Dare we dream of a golden day when the bestial war shall rule no more. But instead the gentle Prince in the Hall of Brotherly Love in the City of Peace'।

শুধু বিষয়বস্তুর দিক থেকেই নয়, চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষার বুনিয়াদ নির্মাণে *The Birth of a Nation*-এর গুরুত্ব চিরকালের জন্য অপরিসীম। বর্ণনাধর্মী দৃশ্য গ্রহণ (Panning), সম্পাদনায় বিপরীত এবং অনুষঙ্গ সুরের মিশ্রণ (Contrapuntal editing), সত্যকার রাতের দৃশ্য গ্রহণ, স্বপ্নদৃশ্যের অভিনব ব্যবহার, বিশেষ বিষয় ফুটিয়ে তুলতে বিশেষ রঙের ব্যবহার ইত্যাদি সমৃদ্ধ এই ছবি চলমান ছবির শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে উপস্থিত হলো নিজস্ব প্রকাশ ভঙ্গিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে। সৃষ্টি করল স্বতন্ত্র মাধ্যমের, স্বতন্ত্র ভাষার; যার উপরেই আবর্তিত হতে থাকল আগামী দিনের যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা। উল্লেখ্য *The Birth of a Nation* চলচ্চিত্রটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল এক লাখ দশ হাজার ডলার। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই চলচ্চিত্রটি আয় করে প্রায় এক কোটি ৮০ লক্ষ ডলার।

গ্রিফিথের সাথে সাথেই চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র আঙ্গিক নিয়ে আবির্ভাব ঘটেছিল চার্লি চ্যাপলিনের (Charles Chaplin: 1889-1977)। ১৯১৪ সালের মধ্যেই চ্যাপলিন জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছালেন। ১৯১৪ সালের ১৪ই নভেম্বর তাঁর পরিচালনায় প্রথম ছবি মুক্তি পেল। ছবিটি ছিল- *Tillie's Punctured Romanee*। এটিই বিশ্বের প্রথম ফিচার লং কমেডি। এ সময়ে তাঁর অন্যান্য ছবিগুলো হলো-*Doughand Dynamite, His Trysting Place, Laughing Gas* এবং *The Face on the Bar-room Floor*। এ সকল ছবিতে চ্যাপলিন তাঁর ভবঘুরে চরিত্রের পূর্ণতা আনার জন্য পরীক্ষা চালান।

১৯২৫ সালে চ্যাপলিন নির্মাণ করলেন *The Gold Rush*। অনেকের মতে এটি চ্যাপলিনের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। চ্যাপলিন নিজেও বলেন, 'This is the picture, I want to be remembered by'। এ বছরই সিনেমার ইতিহাসে ঘটল এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পৃথিবীর মানুষ উপহার পেল এক অবিস্মরণীয় শিল্পকীর্তি। সোভিয়েত পরিচালক সের্গেই আইজেনস্টাইন নির্মাণ করলেন *Battleship Potemkin*। এখনো ছবিটিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশটি ছবির অন্যতম ছবি হিসেবে গণ্য করা হয়।

১৯২৭ সালের ৩রা অক্টোবর নিউইয়র্কের দর্শকদের সামনে হাজির হলো আর এক বিস্ময়কর কীর্তি। ওয়ার্নার ব্রাদার্স হাজির করলেন *The jazz Singer*। ছবিটিকে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রথম সবাক

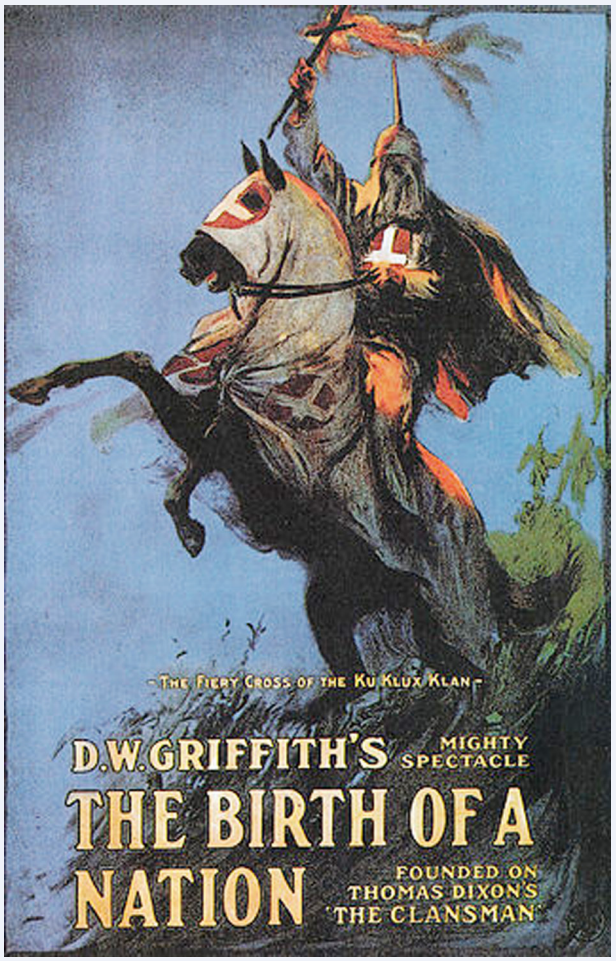

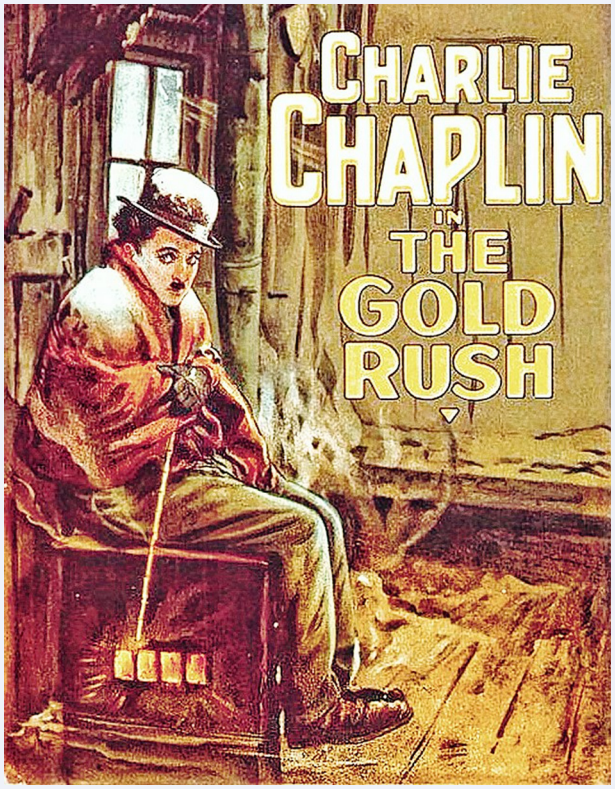

ছবি হিসেবে দাবি করা হয়ে থাকে। যদিও ডিকসন এডিসনকে অভিবাদন করতে সবাক চিত্র হাজির করেছিলেন, কিন্তু ঐ প্রক্রিয়াটি ছিল ফনোগ্রাফের সাহায্যে। সে পদ্ধতির ধারাবাহিকতা দাবি করা হলেও প্রকৃতপক্ষে পুরো চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়েছিল নির্বাক হিসেবে। চিত্র তারকা Al Jolson বলেছিলেন মাত্র কয়েক লাইনের সংলাপ। কিন্তু যে বিষয়টি আলোড়ন সৃষ্টি করল তা হলো গান গাওয়া। এ ঘটনা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নতুন দিগন্তের সূচনা করে।

১৯৩৬ সালে চ্যাপলিন তৈরি করলেন *Modern Times*। যান্ত্রিক সভ্যতাকে তীব্র ব্যঙ্গ করলেন ছবিতে। প্রতিক্রিয়া হলো ভিন্ন রকম। ইটালিতে মুসোলিনি ও জার্মানিতে হিটলার ছবিটি নিষিদ্ধ করলেন। এ ছবিতেই চ্যাপলিনের প্রথম কণ্ঠস্বর শোনা গেল। এ ছবি নির্মাণের বিষয়বস্তু সংগ্রহের বিষয়ে চ্যাপলিন বলেন, '... Then I remembered an interview I had with a bright young reporter on the New York world. Hearing that I was visiting Detroit, he had told me of the factory-belt system there – a harrowing story of big industry luring healthy young men off the tarms who after four or five years at the belt system, became herrous wrecks. It was the conversation that gave me the idea for Modern times' (Page 377-378, *My Autobiography*, Penguin Book 1979 Ed.)

অনেকেই অভিযোগ করলেন চ্যাপলিন ছবিটি ক্লেয়ারের *A Nous Laliberte* থেকে নকল করেছেন। কারণ ক্লেয়ারের ছবিটি নির্মিত হয়েছিল *Modern Times*-এর পাঁচ বছর পূর্বে। এ অভিযোগ সম্পর্কে ক্লেয়ার মন্তব্য করেন–'All cinema is indebted to Chaplin, we are all offspring of this man, whom I admire, and if he has been inspired by my film it is a great honour for me'. (Page 1-2, *Classic Film Scripts*, *A Nous La Liberate & Entracte, film by Rene clair*, Lorrimer Publishing, London 1970).

এভাবে চলচ্চিত্র অনেক চড়াই-উতড়াই পেরিয়ে নিজস্ব শৈল্পিক গুণাবলি ও ভাষার দ্বারা স্বতন্ত্র একটি মাধ্যমে আবির্ভূত হলো। ১৮৯৭-১৮৯৮ সালের দিকে সেলিস চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা সৃষ্টিতে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনিই প্রথম Fade out, dissolve, double exposure ইত্যাদি প্রয়োগ ঘটান। এর পূর্বেই চলচ্চিত্রে রঙের ব্যবহারের প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৮৬১ সালে ম্যাক্সওয়েল (James Clerk Maxwell) প্রথম রঙিন চিত্র গ্রহণের কাজ শুরু করেন। ১৯০৬ সালে স্মিথ 'Brighton School to Film Pioneer' এ সাফল্যের সঙ্গে ফিল্মে রং আনতে সক্ষম হন।

চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। নির্মিত হয়েছে অনেক ভালো ছবি। এ সকল ছবির বর্ণনা শুধুমাত্র এই লেখার কলেবরই বৃদ্ধি করবে না, এ ক্ষুদ্রগণ্ডিতে পুরো ইতিহাস তুলে ধরাও অসম্ভব। তবু কিছু কিছু ভালো ছবির নাম তুলে ধরা যেতে পারে। ইংল্যান্ডের হেপওয়ার্থ (Ceil Hepworth: 1874-1953) *Rescued by Rover* ছবি নির্মাণ করে চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ অবদান রাখেন। ফ্রান্সের জেকা (Ferdinand Jecca: 1864-1947) ফরাসি চলচ্চিত্রে এক স্বতন্ত্র রূপ দানে ভূমিকা পালন করেন। তিনি নির্মাণ করেন *Passion de Notre Signeur Jesus Christ* (1902-1905), *Les Victimes de I' Alecootesme*, *L'Histoire d'un Crime* ইত্যাদি। ১৯২৮ সালে স্পেনে সালভাদোর দালি তৈরি করলেন *un Chiem Andalou*। ছবিটি বুর্জোয় চিন্তারবিরোধী চলচ্চিত্র হিসেবে শাশ্বত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। জাপানে সিজোগুচি, ওজু, কুরোসাওয়া; যুগোস্লাভিয়ায় জুলিস বেইরি, মিহাইলে অল; হাঙ্গেরির আলেক্সান্ডার কোরডা; চেকোস্লোভাকিয়ার কারেল ল্যামাক্, প্রেমাইস্ল প্রাজকি; রাশিয়ার পুডকিন, কুলেশভ এবং ভারটভের প্রমুখ পরিচালক চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে বিকাশ এবং স্বতন্ত্র মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষ অবদান রেখেছেন। এভাবেই, অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে দর্শকের হৃদয়ে স্থান করে নেয় চলচ্চিত্র, আবির্ভূত হয় একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে। (চলবে...)

স. ম. গোলাম কিবরিয়া : মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

পাবলিক প্লেসে ধূমপান দণ্ডনীয় অপরাধ।

প্রবীণদের জন্য ভালোবাসা

প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং একসময় বৃদ্ধ বা প্রবীণ হয়। শৈশব-যৌবন পেরিয়ে একসময় বৃদ্ধ হওয়া মানবজীবনের স্বাভাবিক গতি। শৈশব থেকে প্রাক-যৌবনের যাত্রাপথে মানুষ নিজেকে গড়ে তোলে– তখন সহায়তা পায় পরিবার-পরিজন এবং সমাজ-প্রতিবেশের। এরপর শুরু হয় তার সংসারজীবন, কর্মজীবন। একসময় সে হয় সন্তানের পিতা বা মাতা। ঘর তার ভরে ওঠে– সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নায় অতিবাহিত হয় তার জীবন। স্বাভাবিক এবং জাগতিক নিয়মেই একসময় সে পা পাড়ায় বৃদ্ধত্বের সীমানায়। বৃদ্ধ বা প্রবীণ বয়সে কমে যায় মানুষের কর্মশক্তি, শরীরে বাসা বাঁধে নানা রোগ-ব্যাধি, আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারে প্রবীণ ব্যক্তি হয়ে পড়ে কখনও কখনও বিরাট বোঝা। তখন অনেক ক্ষেত্রেই তারা পায় না প্রত্যাশিত সহযোগিতা কিংবা সহমর্মিতা।

প্রতিবছর ১লা অক্টোবর বিশ্ব প্রবীণ দিবস পালিত হয়। এবছরও বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশেও দিবসটি পালিত হয়। 'সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় প্রবীণদের জন্যে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রজন্মের ভূমিকা' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ৩৩তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস' উপলক্ষে বাণী প্রদান করেন। বাণীতে তিনি বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস' যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।... আমাদের সরকারই সর্বপ্রথম ১৯৯৬ সালে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তন করে। আজ এ উদ্যোগ দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও প্রশংসিত। আমরা প্রতি উপজেলায় বয়স্কভাতা প্রাপ্তিযোগ্য সকল প্রবীণ নাগরিককে পর্যায়ক্রমে এ কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ২০১৩ সালে সরকার জাতীয় প্রবীণ বিষয়ক নীতিমালা, পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন প্রবর্তন করে। আমরা অবসরপ্রাপ্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের জন্য পেনশন সহজীকরণ, বৈশাখী ভাতা প্রদান, ইএফটি-এর মাধ্যমে সরাসরি তাদের পাওনা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। প্রবীণ নাগরিকদের মর্যাদা, অগ্রাধিকার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। সম্প্রতি সরকারি চাকরিজীবীর বাইরে সর্বজনীন পেনশন ভাতা প্রবর্তন আমাদের সরকারের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে দেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠী নিরাপদ আর্থিক সমর্থন লাভের মাধ্যমে শেষ বয়সে পাবেন নিরাপত্তা ও সচ্ছল জীবন ধারণের অনন্য সুযোগ।

প্রবীণ নাগরিকদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সুরক্ষার জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। জাগ্রত করতে হবে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ।

মানুষ সামাজিক জীব। জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধিতে অন্য সকল জীব থেকে সে নিজেকে তুলে ধরেছে অনেক উঁচুতে– নিজের উপরেই সে আরোপ করেছে এই তত্ত্ব 'মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব'। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, প্রবীণ ব্যক্তিদের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান এবং সহযোগিতার প্রশ্নে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব

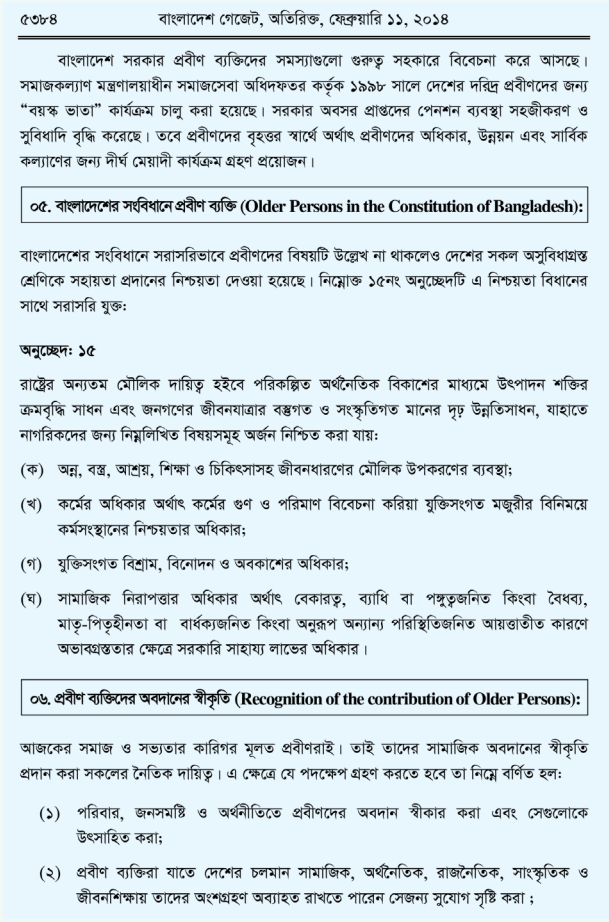

৫৩৮৪ বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১৪

বাংলাদেশ সরকার প্রবীণ ব্যক্তিদের সমস্যাগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে আসছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক ১৯৯৮ সালে দেশের দরিদ্র প্রবীণদের জন্য "বয়স্ক ভাতা" কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সরকার অবসর প্রাপ্তদের পেনশন ব্যবস্থা সহজীকরণ ও সুবিধাদি বৃদ্ধি করেছে। তবে প্রবীণদের বৃহত্তর স্বার্থে অর্থাৎ প্রবীণদের অধিকার, উন্নয়ন এবং সার্বিক কল্যাণের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন।

০৫. বাংলাদেশের সংবিধানে প্রবীণ ব্যক্তি (Older Persons in the Constitution of Bangladesh):

বাংলাদেশের সংবিধানে সরাসরিভাবে প্রবীণদের বিষয়টি উল্লেখ না থাকলেও দেশের সকল অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণিকে সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। নিম্নোক্ত ১৫নং অনুচ্ছেদটি এ নিশ্চয়তা বিধানের সাথে সরাসরি যুক্ত:

অনুচ্ছেদ: ১৫

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

(খ) কর্মের অধিকার অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসংগত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

(গ) যুক্তিসংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার;

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃ-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার।

০৬. প্রবীণ ব্যক্তিদের অবদানের স্বীকৃতি (Recognition of the contribution of Older Persons):

আজকের সমাজ ও সভ্যতার কারিগর মূলত প্রবীণরাই। তাই তাদের সামাজিক অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা নিম্নে বর্ণিত হল:

(১) পরিবার, জনসমষ্টি ও অর্থনীতিতে প্রবীণদের অবদান স্বীকার করা এবং সেগুলোকে উৎসাহিত করা;

(২) প্রবীণ ব্যক্তিরা যাতে দেশের চলমান সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জীবনশিক্ষায় তাদের অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখতে পারেন সেজন্য সুযোগ সৃষ্টি করা ;

সূত্র: জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩, বাংলাদেশ গেজেট, ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪

ভয়াবহভাবে হোঁচট খায়। তখন দেখা দেয় মানুষের ভিন্ন এক রূপ। যে সন্তানের সুখের জন্য পিতা বা মাতা নিজের সুখ উপেক্ষা করেছেন, ভয়ানক কষ্ট করে সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন–সেই সন্তানই প্রবীণ মা-বাবাকে উপেক্ষা করছে– কখনও ঠিক মতো খেতে দিচ্ছে না– কোনো কোনো সময় ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে। প্রসঙ্গত নিকট অতীত থেকে আমরা দুটো ঘটনা উল্লেখ করতে পারি।

করোনাভাইরাস যখন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে, যখন আবিষ্কৃত হয়নি এই ভাইরাস প্রতিরোধের ভ্যাকসিন, মানুষ তখন ভীষণভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। এই বিপন্নতার সময়খণ্ডে, পত্রিকান্তরে আমরা দেখেছি, টাঙ্গাইলের এক বৃদ্ধা মা, যিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত, তাকে তার গর্ভজাত ছেলেমেয়ে রাতের আঁধারে দূরবর্তী বাঁশ ঝাড়ে ফেলে আসে! কী অমানবিক আচরণ মায়ের প্রতি সন্তানের। মায়ের চিকিৎসা করতে হবে, খরচ হবে অর্থ– এ কারণেই কি সন্তানের এসব আচরণ? না-কি ভাইরাসে সন্তানও আক্রান্ত হতে পারে, তাই অসুস্থ মাকে দূর করে দেওয়া? সন্তানের কাছে এই কি মায়ের প্রাপ্তি?

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, সিরাজগঞ্জের চৌহালীতে পাঁচ ছেলের ঘরে ঠাঁই হয়নি বৃদ্ধ পিতা-মাতা হামিদ মোল্লা ও ফজিলা খাতুনের। পিতা-মাতার ভরণপোষণকে উটকো ঝামেলা মনে করে পাঁচ ভাই একত্র হয়ে মা-বাবাকে দূরে নির্জন স্থানে রাতের আঁধারে ফেলে আসে। কী নির্মম-নিষ্ঠুর আচরণ সন্তানের! পশুপাখিও তো এমন আচরণ করে না। বরং সেখানে দেখা যাবে উল্টো চিত্র। তাহলে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের ক্ষেত্রে কেন এমন ঘটছে?

বর্তমান পৃথিবী পণ্যের পৃথিবী– এ পৃথিবী সব কিছুকে পণ্য বানিয়ে তুলেছে। সে কারণে কর্তব্য-দায়িত্ব-ভালোবাসা আজ উধাও। সব কিছুই যেহেতু পণ্য, তাই যার পণ্যমূল্য নেই তা পরিত্যাজ্য, অপাঙ্‌ক্তেয়। এ কারণেই পণ্যমূল্যহীন পিতা-মাতার ঠাঁই হয় না সন্তানের সংসারে–এমনকি নিজের তোলা ঘর থেকেই তাকে এক সময় বের হয়ে যেতে হয় কিংবা বের করে দেয় সন্তানেরা। বৃদ্ধ বয়সে কখনও তার আশ্রয় হয় বৃদ্ধাশ্রমে, কখনওবা পথের ধারেই কাটে তার জীবন। বৃদ্ধাশ্রমে পিতা বা মাতা কীভাবে আছে, সন্তান তার খবর নেয় না– যে ফুটপাথে মা শুয়ে আছে, তার পাশ দিয়েই সন্তান হয়ত গাড়ি হাঁকিয়ে চলে পণ্য-পৃথিবীর বাজার ধরতে।

পুঁজিবাদ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এ কালের মানুষ হয়ে পড়েছে পরিবার বিচ্ছিন্ন, সংসার বিচ্ছিন্ন, সমাজ বিচ্ছিন্ন। কেউ কারো খবর নেয় না– কেউ কারো দায়িত্ব পালন করে না। সর্বগ্রাসী বিচ্ছিন্নতা মানুষকে মানব-অস্তিত্ব থেকে রূপান্তরিত করে দিয়েছে পাশব-অস্তিত্বে। পুঁজিবাদ সৃষ্টি সামূহিক বিচ্ছিন্নতার প্রেক্ষাপটে মানুষের মানবিকচেতনা ও দায়িত্বচেতনা অবলুপ্ত হয়েছে– ফলে উপার্জনহীন পণ্যমূল্য শূন্য পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তান আর কোনো সম্পর্ক উপলব্ধি করে না। তাই অসুস্থ মাকে ফেলে আসা হয় বাঁশ বাগানে, কিংবা পাঁচ ভাই মিলে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ফেলে আসে দূরবর্তী দুর্গম নির্জন স্থানে।

এ চিত্রের বিপ্রতীপ চিত্র যে নেই, তা কিন্তু নয়। অনেক সন্তানই এখনও বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা-শুশ্রূষা করে, বৃদ্ধ মা-বাবা পায় প্রত্যাশিত যত্ন। যুগের হাওয়ার বিপরীতে দাঁড়িয়েই তারা পালন করে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য। পূর্ব-পৃথিবীর মানুষ আমরা। আমরা এখনও পশ্চিম-পৃথিবীর মতো সম্পূর্ণ যান্ত্রিক হয়ে উঠিনি। তাই বুঝি ভুলে থাকতে পারি না প্রবীণ বাবাকে, বৃদ্ধ মাকে। এটাই হওয়া বিধেয়। আমরা মাকে ভালোবাসবো, ভালোবাসবো বাবাকে– বয়স তাদের যতই হোক না কেন। কেবল মা-বাবাকে নয়, পৃথিবীর সকল প্রবীণ-প্রবীণাকেই আমরা ভালোবাসবো, শ্রদ্ধা করব– এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ: শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক

দুর্নীতিকে না বলুন

রুখবো দুর্নীতি, গড়বো দেশ
হবে সোনার বাংলাদেশ

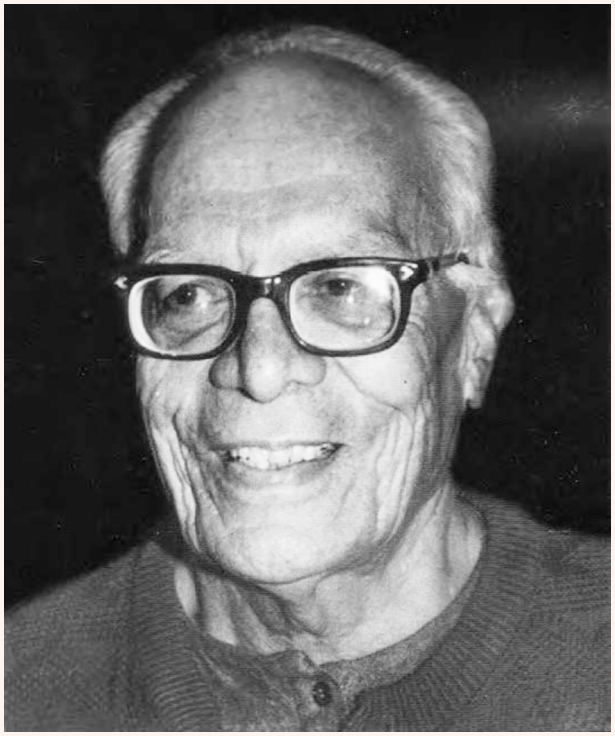

লাগসই উন্নয়ন ও একজন আখতার হামিদ খান

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী, উন্নয়নকর্মী, কুমিল্লার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর (বার্ড) প্রতিষ্ঠাতা আখতার হামিদ খান (১৯১৪-১৯৯৯) আগ্রায় ১৫ই জুলাই ১৯১৪ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা খান সাহেব আমির আহমেদ খাঁন এবং মাতা মাহমুদা বেগমের চার পুত্র এবং তিন কন্যা সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। তাঁর পিতা ছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর যিনি স্যার সৈয়দ আহমদের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। তাঁর মা ফারসি ও উর্দু সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন। পুত্রকে তিনি মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমি (১২০৭-১২৭৩)-র মসনবী ও আল্লামা ইকবালের (১৮৭৭-১৯৩৮) কবিতা এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদের (১৮৮৮-১৯৫৮) বক্তৃতা শোনাতেন। এসব থেকে তিনি সারবান শাস্ত্র , সমাজ-সংস্কৃতি ও মানবতাবোধের দ্বারা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হন। উত্তর প্রদেশের জালাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং আগ্রা কলেজে ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করেন। ১৯৩২ সালে মিরাট কলেজ থেকে অনার্স এবং ১৯৩৪ সালে তিনি আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে (আইসিএস) যোগ দেওয়ার আগে কিছুদিন তিনি মিরাট কলেজে অধ্যাপনা করেন। আইসিএস-এর শিক্ষানবিশ হিসেবে তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য এবং ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। এসময় তিনি চৌধুরী রহমত আলীর (১৮৯৫-১৯৫১) সান্নিধ্য ও বন্ধুত্ব লাভ করেন।

আইসিএস অফিসার হিসেবে আখতার হামিদ খান কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় পূর্ব বাংলায় চাকরি করেন। ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে এসময় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় দুর্বিষহ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন। ১৯৪৩ সালে বাংলায় যে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় সেখানে ব্রিটিশ সরকারের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি মর্মাহত হন। ১৯৪৩-এর মহা মন্বন্তরের সময় ঔপনিবেশিক শাসকদের উদাসীনতা তাঁকে এতটাই ব্যথিত করে যে, তিনি ১৯৪৫ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি লিখেছেন– 'I realised that if I did not escape while I was young and vigorous, I will forever remain in the trap and terminate as a bureaucratic big wig.' (*The Works of Akhtar Hameed Khan*. Volumes I–III. Comilla: Bangladesh Academy for Rural Development,1983. P xxii). এ প্রসঙ্গে তাঁর আইসিএস সহকর্মী ও সাহিত্যিক অন্নদা শঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২) লিখেছেন,

> আমি তখন নদীয়ার জেলা জজ। আর আখতার সেই দিন পর্যন্ত ছিলেন নেত্রকোণার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট। সে দিনই ডালহাউসী স্কোয়ারে গিয়ে চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে তর্ক করে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে আসেন। সেটা মন্বন্তরের বছর। আখতার তাঁর স্বকীয় পদ্ধতিতে তাঁর এলাকায় দুর্ভিক্ষ ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। 'তা বলে আপনি চাকরিতে ইস্তফা দিতে গেলেন কেন? ছুটি চাইতে পারতেন, বদলী চাইতে পারতেন'। আমি অনুযোগ করি। 'জজ আপনারও ইস্তফা দেওয়া উচিত। লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, আর আপনারা সরকারী কর্মচারীরা চোখ বুজে চাকরি করে যাচ্ছেন'। আখতার খোঁচা দেন। 'কিন্তু আমি তো বিচার বিভাগের কর্মচারী। আমি কেন এর জন্য দায়ী হব'? আমি তর্ক করি। 'গোটা সরকারটাই এর জন্য দায়ী। আপনিও এর অঙ্গ। এই অন্যায়কারী সরকারের অসহযোগ করাই আপনার কর্তব্য'। আখতার আমার বিবেকে নাড়া দেন।
>
> চাকরিটা তিনি সত্যি সত্যিই ছেড়ে দেন। পরে একদিন আলীগড় থেকে এক চিঠি পাই। তিনি সেখানে তালা তৈরী করছেন ও করতে শেখাচ্ছেন। সেভাবেই নাকি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার দশা দূর হবে। মন্দ কী? আমি উৎসাহ দিই। দেশ একদিন সত্যি সত্যি ভাগ হলো। তিনি প্রথমটা হলেন ভারতীয় নাগরিক, অধ্যাপনার কাজ নিলেন দিল্লীর জামিয়া মিলিয়ায়। পরে হলেন পাকিস্তানের নাগরিক। আহ্বান পেয়ে কুমিল্লায় ফিরে গেলেন ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষরূপে। সেখান থেকে আমাকে উপহার পাঠিয়ে দেন এক থান চমৎকার খাদি। তাঁর কিংবা তাঁর বেগমের হাতের কাজ। দেশভাগ হলেও খাদির উপর বিশ্বাস যায়নি দেখে আমি আনন্দিত। এরপরে তিনি আবার চাকরি ছাড়েন। এবার চাষীদের নিয়ে এক পরিকল্পনা করেন। সমবায় পদ্ধতিতে সেচ ও চাষ। (*'আইসিএস' অন্নদা শঙ্কর রায়*, ডি এম লাইব্রেরী কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ ৪৭-৪৯)

আখতার হামিদ খান কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত চাকরি করেন।। কুমিল্লায় অবস্থানকালে গ্রামের উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহ জাগে। এসময় তিনি ১৯৫৮ সালে মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পল্লি উন্নয়নের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত করার

লক্ষ্যে ২৭শে মে ১৯৫৯ সালে তিনি কুমিল্লায় বার্ড প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন। পরিচালক হিসেবে এবং ১৯৬৪ সাল থেকে এর পরিচালনা পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের বেসরকারি শিক্ষক সমিতির সভাপতি হন। তিনি ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কাজ করেন।

১৯৫৪ এবং ১৯৫৫ সালে কিছুদিনের জন্য তিনি এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড ইন্ড্রাস্টিয়াল ডেভেলপমেন্ট (ভি-এইড) প্রোগ্রামের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) আখতার হামিদ খানকে কিংবদন্তিতে পরিণত করে এবং তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তিনি পাকিস্তানে চলে যান এবং প্রথমে লায়ালপুরস্থ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ফেলো হিসেবে ১৯৭২-১৯৭৩ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। ১৯৭৩-১৯৭৯ সালে তিনি মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭৮-১৯৭৯ সালে তিনি বগুড়ায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সুইডেনের লুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উড্র উইলসন স্কুল, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কাজ করেন। ১৯৮০ সালে আখতার হামিদ খান করাচিতে ওরাঙ্গি পাইলট প্রজেক্ট (ওপিপি) প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর পরিচালক হন। সে থেকে ওপিপি এশিয়ার বৃহত্তম 'এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প' হিসেবে চালু রয়েছে। বার্ড-এর মতোই ওপিপি একটি আদর্শ সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

ইংরেজি, বাংলা, আরবি, ফারসি, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় দক্ষ আখতার হামিদ খান বহু নিবন্ধ, প্রতিবেদন ও গ্রন্থ রচনা করেছেন।

- 1965, Rural Development in East Pakistan, Speeches By Akhtar Hameed Khan. Asian Studies Center, Michigan State University.
- 1974, Institutions for rural development in Indonesia, Pakistan Academy for Rural Development. Karachi.
- 1985, Rural development in Pakistan. Vanguard Books. Lahore.
- 1994, What I learnt in Comilla and Orangi. Paper presented at the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) seminar. Islamabad.
- 1996, Orangi Pilot Project: Reminiscences and Reflections. The Oxford University Press: Karachi. (editions: 1996, 1999, 2005). ISBN 978-0-19-597986-2
- 1997, The sanitation gap: Development's deadly menace. The Progress of Nations. UNICEF.
- 1998, Community-Based Schools and the Orangi Project. In Hoodbhoy, P (ed.), Education and the State: Fifty Years of Pakistan, Chapter 7, Karachi: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-577825-0

বার্ড তাঁর লেখাগুলোকে তিনটি খণ্ডে *দ্য ওয়ার্কস অব আখতার হামিদ খান* (১৯৮২) শিরোনামে প্রকাশ করেছে। পল্লি উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রণী ভূমিকার জন্য তাঁকে সিতারা-ই-পাকিস্তান (১৯৬১) ও ম্যাগসেসেই পুরস্কার প্রদান করা হয়। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৪ সালে তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টর অব লজ'তে ভূষিত করে।

১৯৯৯ সালে আখতার হামিদ খান আমেরিকায় তাঁর পরিবারের সাথে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর কিডনি বিকল হয়ে যায়। তিনি মায়োকারডিয়াল ইনফ্রাকশানো ৯ই অক্টোবর ইন্ডিয়ানপলিসি-এ ৮৫ বছর বয়সে মারা যান। ১৫ই অক্টোবর তাঁর অফিস প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়। আখতার হামিদ খানের শিক্ষা, তাঁর কর্মস্পৃহা, তাঁর আদর্শ তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর সহকর্মী, ছাত্র ও শুভানুধ্যায়ীদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। ইউএসএইড-এর এশিয়া ব্যুরোতে কাজ করার সময় এডগার-এর সাথে একটা বই লিখেছেন এ ব্যাপারে। দক্ষিণ এশিয়ায় পল্লি উন্নয়নের ওপর পরিবর্তীকালে যত গবেষণা ও কাজ হয়েছে তার ওপর Uphoff এবং Cambell সাহেব ১৯৮৩ সালে যে বিশাল সংকলন সম্পাদনা করেন সেটি আখতার হামিদ খান ও ওয়েনকে উৎসর্গ করা হয়েছে। খানের মৃত্যুর পর পাকিস্তান সরকার ন্যাশনাল সেন্টার ফর রুরাল ডেভেলপমেন্টকে আখতার হামিদ খানের নামে নামকরণ করে এবং আরও পরে ইসলামাবাদে আখতার হামিদ খানের নামে জাতীয় পুরস্কারও প্রবর্তিত হয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে ফিরে গেলে পাকিস্তান সরকার আখতার হামিদ খানকে কুমিল্লা মডেলের অনুসরণে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। কর্মসূচিটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্বলিত মনে হওয়ায় খান তা বাস্তবায়নে অপারগতা প্রকাশ করেন। তিনি কর্তৃপক্ষকে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে কীভাবে সমবায়ভিত্তিক করা যায় সে ব্যাপারে উপদেষ্টা ভূমিকায় চলে আসে। ফয়সালাবাদ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ১৯৭১-১৯৭২ রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করেন এবং ১৯৭২-১৯৭৩ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাইরেক্টর অব রুরাল ইকোনমিক রিসার্চ প্রজেক্ট হিসেবে সংযুক্ত হন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থে ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান সরকার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে Village Agricultural and Industrial Development (V-AID) Program চালু করে। ভি-এইড মূলত সরকারি কর্মসূচি হিসেবে পল্লি অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন ব্যবস্থা সম্প্রসারণে সীমাবদ্ধ থাকে। কুমিল্লায় জনাব খান ১৯৫৯ সালে এ কর্মসূচি চালু করে এক বছরের জন্য মিশিগানে যান এবং সেখানে তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ চাষি বা পল্লিবাসীদের অংশগ্রহণে উন্নয়নের মডেল নির্মাণে তালিম নেন। মূলত কুমিল্লা প্রকল্পে হার্ভার্ড, মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, ইউএসএইড এবং ফার্মিং টেকনিক কুমিল্লা মডেল স্থানীয় পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ব্যবস্থা সংযুক্ত হয়। এর মধ্যে ট্রেনিং ও ডেভেলপমেন্ট, রোড ড্রেনেজ এম্বাঙ্কমেন্ট ওয়ার্কস প্রোগ্রাম, ডিসেন্ট্রালাইজড, স্মল স্কেল ইরিগেশন প্রোগ্রাম এবং টু টায়ারয কো অপারেটিভ সিস্টেম অন্যতম।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ: সরকারের সাবেক সচিব ও এন বি আর-এর সাবেক চেয়ারম্যান

সঞ্চয়ের গুরুত্ব

ড. এন. এইচ. এম. রুবেল মজুমদার

প্রতিবছর ৩১শে অক্টোবর 'বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবস' বা 'ওয়ার্ল্ড থ্রিফট ডে' (World Thrift Day) পালন করা হয়। দিবসটি 'বিশ্ব সঞ্চয় দিবস' (World Savings Day) নামেও পরিচিত। সারা বিশ্বে এ দিবসটি পালন ও প্রচারের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও জাতির কল্যাণে তথা জাতীয় উন্নয়নের জন্য সবাইকে মিতব্যয়ী হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। অর্থনীতিবিদ বা বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুযায়ী, ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন বা সংযম করার মাধ্যমে অর্থাৎ পারিবারিক ও সংসারজীবন থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ের সকল স্তরে আয় বুঝে ব্যয় করার মানে হলো মিতব্যয়িতার অর্থ।

যে-কোনো অপচয় দেশ, সমাজ ও পরিবারের জন্য যেমন ক্ষতিকর, তেমনি অপচয়কারীরা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কিছুই করতে বা কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। প্রাচীন প্রবাদে বলা আছে,'অপচয় করো না অভাবও থাকবে না'। আমিত কালান্ট্রির মতে, 'জীবনে কখনো খাবার, পানি, সম্পদ এবং সময়কে অপচয় করো না'। বিজ্ঞানী ফ্রাকলিন এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ছোটো ছোটো ব্যয় সম্পর্কে সাবধান হও, ও একটি ছোটো ছিদ্র মস্তো বড়ো জাহাজকে ডুবিয়ে দিতে পারে'। ব্রুইয়ের মতবাদ অনুযায়ী, 'অপব্যয়ী লোক তাদের উত্তরাধিকারীদের সর্বস্বান্ত করে আর কৃপণ করে নিজেকে সর্বস্বান্ত'। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার যথার্থই বলেছেন, 'যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি, আশু গৃহে তার দেখিবে না আর নিশীথে প্রদীপ ভাতি'। তাই ধর্মীয় আদর্শ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার আলোকে মিতব্যয়িতা, অপচয় এবং অপব্যয় দেশ, সমাজ ও পরিবারের জন্য বিশেষ গুরুত্ব ও প্রভাব বিস্তার করে। ইসলামে মিতব্যয় সম্পর্কে সুরা ফুরকানের ৬৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেছেন, 'রহমানের বান্দা তারাই যারা ব্যয়ের সময় অপব্যয় করে না আবার কার্পণ্যও করে না। বরং এ দুয়ের মধ্যে মধ্যপন্থায় তারা থাকে'। মিতব্যয় প্রসঙ্গে সুরা বনি ইসরাইলের ২৬-২৯ নম্বর আয়াতে আরও ইরশাদ হয়েছে, 'অপচয় করো না। অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। তুমি (কার্পণ্য করে) তোমার হাত ঘাড়ে আটকে রেখ না; আবার (অধিক ব্যয় করতে গিয়ে) তা সম্পূর্ণ প্রসারিত করো না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে যাবে'। অর্থাৎ, ইসলাম অপব্যয় এবং কৃপণতার ব্যাপারে সতর্ক করে মিতব্যয়িতার নির্দেশ দিয়েছে বার বার। আয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রয়োজন অনুপাতে ব্যয় করাটা ইসলামে কাম্য। ইসলামি অর্থনীতিতে অপচয় ও অপব্যয় কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের সমাজের অপচয়ের নানাদিক পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে সময়ের অপচয় অন্যতম। কেউ যদি সময়কে সঠিকভাবে কাজে না লাগিয়ে তা অবহেলায় কাটিয়ে দেয়, তাহলে এর চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছুই হতে পারে না। একেকটি মুহূর্ত একেকটি সুযোগ। কারোই উচিত নয় একটি মুহূর্তও অপচয় করা। সব মিলিয়ে ইসলাম মানুষকে ভারসাম্য রক্ষা করে চলার উপদেশ দেয় এবং ঐশী অনুগ্রহের ব্যাপারে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ও অর্থ-সম্পদের সদ্ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করে। অপরদিকে সনাতন বা হিন্দু ধর্মেও 'সর্বপ্রকার, লোভ-লালসামুক্ত হয়ে, নিষ্কাম ব্রাহ্মচর্য ও সন্ন্যাসব্রতকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এতে ভ্রমণ, সৎ পথে জীবন চালনা, উপদেশ প্রদান ভক্তদেরসহ সমাজকল্যাণ সাধিত হয়'।

রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় ও অপব্যবহার রোধ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় সংকোচন তথা মিতব্যয়ী হওয়া রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণ বয়ে আনে। লেখক ও গবেষক জনাব সৈয়দ আবুল মকসুদ বাংলাদেশ সম্পর্কিত 'অপচয়, অপব্যয় ও অপরিচ্ছন্নতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় ও অপব্যবহারকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, 'রাষ্ট্রীয় অর্থ ও সম্পদের যদি কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবেও অপব্যয় করে, তাকে শাস্তির জন্য আদালতের কাঠগড়ায় খাড়া করা সম্ভব হয় না, অথচ অপচয় ও অপব্যয় একটি দেশকে ভেতর থেকে ক্ষয় করে দেয়, বাঁশে বা কাঠে ঘুণ বা উইপোকা লাগলে যা হয়; ওপর থেকে সহজে চোখে পড়ে না'। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, 'দেশের সরকারি, আধা-সরকারি অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত ঘরবাড়ি স্থাপনায় প্রতি মুহূর্তে যে অপচয় ও অপব্যয় হচ্ছে তার মূল্য যোগ দিলে প্রতিদিন দাঁড়াবে শত শত কোটি টাকা'। তাই রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয়কারীদের বিরুদ্ধে নির্মম শাস্তির ব্যবস্থা করে অপচয় ও দুর্নীতি কঠোরভাবে দমন করা দরকার। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সম্পদের বিভিন্ন খাতে যত বেশি অপচয় হচ্ছে তার ভেতরে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে খাবারের টেবিল, গৃহস্থকাজ থেকে শুরু করে সরকারি, আধা-সরকারি অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পানির অপচয়, বিদ্যুতের অপচয় ও সরকারি দিবস উদ্‌যাপনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয়ে এবং অফিসের আসবাব ও তৈজস কেনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। যদিও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গত এক দশকে বিদ্যুৎ খাতে উৎপাদন বেড়েছে প্রায় তিনগুণ, এ খাতে অপচয় জিডিপির প্রায় দুই দশমিক ৪৬ শতাংশ, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ লাখ ৫ হাজার ৪১৯ কোটি টাকা। অবশ্য আরও উল্লেখ্য যে, বিদ্যুৎ খাতের এই অতিরিক্ত ব্যয়ের পেছনে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কম মূল্যে গ্যাস সরবরাহ যা সরকারি ভর্তুকির অংশ। তবে আশা করা যাচ্ছে যে, ২০২৪ সাল নাগাদ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি (প্রথম ও দ্বিতীয়) ইউনিটে ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হলে দেশের ১৮ লাখ পরিবার এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সুবিধা লাভ করবে। পাশাপাশি বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ খাতে অপচয় রোধে এর প্রধান তিনটি খাত যেমন– প্রাতিষ্ঠানিক, নিয়ন্ত্রক ও সামাজিক খাতে আরও দৃষ্টি দিচ্ছে যাতে অতিরিক্ত ব্যয় ও অপচয় কমে আসে।

বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরো ও জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) হালনাগাদ প্রক্ষেপণের তথ্য মতে, ২০২৩ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হচ্ছে ১৭ কোটি ৩০ লাখ এবং ২০৫০ সালে তা দাঁড়াবে ২০ কোটি ৩০ লাখ। জনসংখ্যার এ ঊর্ধ্বগতির কারণে বাড়তি খাদ্যের চাহিদা মেটাতে বর্তমান সরকার ২০০৯ সাল থেকে কৃষি খাদ্য খাতে বিশেষ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে এবং দেশ ইতোমধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে বিশ্বের দরবারে রোল মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানা আয়ব্যয় জরিপ ২০২২ প্রতিবেদন অনুযায়ী, অর্থনীতি আর সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষের মাঝে খাদ্য গ্রহণে পরিবর্তন এসেছে। মানুষ আজকাল বিভিন্ন দেশি-বিদেশি রেস্টুরেন্টের বদৌলতে নানা দেশের নানা স্বাদের খাবার বাহিরে খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, কিন্তু এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অপচয়। বাংলাদেশে প্রতিবছর যত খাবার উৎপাদন হয়, তারও একটি বড়ো অংশ ভাগাড়ে যায়, মানে নষ্ট হয়। নিজ টেবিল থেকে শুরু করে, হোটেল, রেস্তোরাঁ বা বুফে খেতে এসে অনেকেই অতিরিক্ত পরিমাণ খাবার অপচয় করেন। জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা 'ইউনেপ ২০২১ ফুড ওয়েস্ট ইনডেক্স'-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে গৃহস্থালি পর্যায়ে বছরে ১ কোটি ৬ লাখ টন (১০,৬১৮,২৩৩ টন/বছর) খাদ্য অপচয় করে, যা মাথাপিছু প্রতিবছরে ৬৫ কেজি। অপরদিকে, হোটেল এবং রেস্তোরাঁ অর্থাৎ খাদ্য সার্ভিস বা সেবা প্রদানকারী সংস্থার দ্বারা এ অপচয় বছরে ৫ লাখ টন, যা মাথাপিছু প্রতিবছরে ৩ কেজি। ইউনেপ ২০২১ ফুড ওয়েস্ট ইনডেক্স-এর রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, গৃহস্থালি ও খাদ্য সার্ভিস বা সেবা প্রদানকারী সংস্থার বাহিরে রিটেইল পর্যায়ে বছরে ২৫ লাখ টন খাদ্য অপচয় হয়, যা মাথাপিছু প্রতিবছরে ১৬ কেজি। তাই বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির খাদ্য অপচয় সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ফসলের মাঠ থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত আসতে প্রতিবছর দেশে ৩৭ লাখ টনের বেশি খাবার নষ্ট হচ্ছে। এবং তাদের তথ্যানুযায়ী যদি এই সকল খাবার নষ্ট না হতো তবে তা দিয়ে বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষকে তিন মাস খাওয়ানো যেত। এই বাস্তবতায় দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য প্রণিধানযোগ্য এই যে, খাদ্যের অপচয় সকল স্তরে হ্রাস করার জন্য মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষাকে কাজে লাগাতে হবে। করোনা মহামারি ও বৈশ্বিক অস্থিতির কারণে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বার বার বৈশ্বিক খাদ্য সংকটের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে। ২০২৩ সালে বৈশ্বিক খাদ্য সংকট হবে এই হুঁশিয়ারিকে আমলে নিয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণকে সম্ভাব্য খাদ্য সংকটের বিষয়ে সতর্ক করেছেন এবং বেশি করে মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী হবার তাগিদ দিয়েছেন। ব্যক্তি ও জাতীয় পর্যায়ে সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও পরিমিত খাদ্যগ্রহণই দিতে পারে উত্তম পন্থা ও সমাধান। বৈশ্বিক খাদ্য চাহিদার পাশাপাশি বৈশ্বিক খাদ্য অপচয়ও উদ্বেগের বিষয়। বিশ্ব ব্যাংকের ২০২৩ সালের তথ্যানুযায়ী, বৈশ্বিক খাদ্য উৎপাদন পর্যাপ্ত হওয়ার পরেও মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগ অভুক্ত থাকে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার আরও একটি সমীক্ষা মতে, প্রতিবছর না খেয়ে মারা যায় ১ কোটি লোক এবং বিশ্বে প্রতিদিন প্রায় ১৮-২০ কোটি লোক ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটায়। অথচ ইউনেপ ২০২১-এর রিপোর্ট অনুযায়ী সারা বিশ্বে প্রতিবছরে উৎপাদিত খাবারের ৯ কোটি টন চলে যায় ডাস্টবিনে এবং যা প্রতিদিনের ৩ ভাগের ১ ভাগ খাদ্য। অথচ অপচয়কৃত খাবারের ৪ ভাগের ১ ভাগ দিয়ে ওই ১০ ভাগ অভুক্ত মানুষকে খাওয়ানো যেত। গবেষণার তথ্য থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত অপচয়কৃত খাদ্য উৎপাদনের জন্য সারা বিশ্বের মোট বিশুদ্ধ পানির প্রায় ২৫ ভাগ ব্যবহৃত হয় যা বৈশ্বিক জলবায়ু সংকটের জন্য দায়ী।

অপচয়-অপব্যয় মনে হয় যেন আমাদের সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, বিশেষ করে আমরা বিয়ে, মেজবানসহ পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে সরকারি বিভিন্ন দিবস পালন বা উদ্‌যাপনে মাত্রাতিরিক্ত আলোকসজ্জার ব্যবহারের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে খাবার, পানি, বিদ্যুৎ অপচয় করে থাকি। বাংলাদেশের মতো একটি মধ্য-উন্নয়নকামী দেশে আবাসস্থল থেকে শুরু করে অফিস-কলকারখানায় এই সীমাহীন অপচয় অবশ্যই ক্ষমার অযোগ্য একটি অপরাধ। অথচ এসব অপচয়-অপব্যয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া জনগণের যেমন অভাব, তেমনি সামাজিক আন্দোলন ও সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ খুবই কম দেখা যায়। বরং সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষের মধ্যে একধরনের প্রচ্ছন্ন সায় লক্ষ করা যায়, যার মাশুল দিতে হয় সমাজের নিম্ন শ্রেণির মানুষগুলোকে। উদাহরণস্বরূপ ২০২১ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) একটি গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে উচ্চ আয়ের পরিবারে বেশি খাদ্য অপচয় হয়, যা মাসে মাথাপিছু ২৬ কেজি। সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষের মধ্যে খাবার থেকে শুরু করে অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের প্রতি এই বিলাসিতাকে সমাজবিদরা 'কমোডিটি ফেটিশিজম' (commodity fetishism) বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, মাত্রাতিরিক্ত কমোডিটি ফেটিশিজম বর্তমানে স্মার্টনেস-এর পরিবর্তে একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।

সঞ্চয়ী হয়ে ওঠার জন্য মানুষের ভেতরের এই প্রবণতাটিকে সবার আগে পরিহার করা জরুরি। বিশ্ব পরিসংখ্যান আরও বলছে, ধনী বা উন্নত দেশসমূহে কমোডিটি ফেটিশিজম যদি সীমিত করা যায় তবে যে পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় বা সম্পদের মিতব্যয়িতা হবে তাতেই এশিয়া-আফ্রিকার মতো দরিদ্র দেশের লোকদের অর্থ কষ্ট দূর করা সম্ভব। তাই আমাদের দেশেও জাতীয় সম্পদের অপচয়, সামাজিক বৈষম্য ও অবক্ষয় ইত্যাদি দূরীকরণে অপব্যয়-অপচয়ের বিরুদ্ধে দেশের সকল স্তরে সামাজিক আন্দোলন দরকার। এ ব্যাপারে সরকার, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা বেশ জোরালোভাবে দরকার। অবশ্য বাংলাদেশ সরকার বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারি ব্যয়ে কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণ করেছে। কঠোর নজরদারির আওতায় আনা খাতগুলো হচ্ছে– বৈদেশিক ঋণ ও ঋণের সুদ এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাঁদা পরিশোধ খাত। এছাড়া বাজেটে থোক বরাদ্দ, সরকারি চাকরিজীবীদের বেতনভাতা, পিআরএল ও শ্রান্তি বিনোদন সংক্রান্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর পেছনে ব্যয়। পাশাপাশি সরকারের গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ও টেলিফোন খাতের বিল পরিশোধ, ভূমি উন্নয়ন কর, জ্বালানি খাতে ব্যয় খাতও পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। সরকারের ব্যয় সংকোচন নীতিতে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরাও। তারা বলেন, এর ফলে অর্থের অপচয় কমবে। অর্থনীতিতে স্বস্তি ফিরে আসবে।

মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়– এ দুইটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিবেচনায় ১৯২১ সালে সর্বপ্রথম স্পেন ও যুক্তরাষ্ট্রে 'জাতীয় সঞ্চয় দিবস' পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্তীতে ১৯২৪ সালে ইতালির মিলান শহরে ২৯টি দেশের ব্যাংকের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন সঞ্চয় ব্যাংকের প্রতিনিধিদের দ্বারা বিশ্ব কংগ্রেসে গৃহীত এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ব সঞ্চয় দিবস পালন শুরু করার জন্য সহমত পোষণ করা হয় এবং কংগ্রেসের শেষ দিনে ইতালীয় প্রফেসর ফিলিপ্প রাভিজ্জা বিশ্ব অর্থনীতিকে আরও সুদৃঢ় করার মাধ্যমে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য অনুযায়ী সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি ও মানুষের মনে সঞ্চয়ের ধারণাকে আরও জোরদার করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ দিনটিকে বিশ্ব সঞ্চয় দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, তাদের সঞ্চয় ব্যাংক ও সহযোগী সংস্থাসমূহ মিতব্যয় ও সঞ্চয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণের মনোযোগ ও অংশগ্রহণ জোরদার করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিকভাবে দিবসটি পালন করে আসছে। বর্তমানে ৩১শে অক্টোবর বিশ্ব মিতব্যয়িতা বা সঞ্চয় দিবস বিশ্বের ৮০টিরও বেশি দেশে পালন করা হয়। উন্নত দেশের পাশাপাশি বর্তমানে বাংলাদেশেও প্রতিবছর সরকারিভাবে বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবস পালিত হয়। জাতীয় উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবস বা বিশ্ব সঞ্চয় দিবসকে বেশ গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় রেখেছে। ১৯৭১-এ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারপর দীর্ঘ ৪২ বছর পর ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করেন। অর্থনীতিবিদদের অভিমত অনুযায়ী, ব্যক্তি পর্যায়ে স্বেচ্ছায় সম্পদ আহরণ তথা অপচয় রোধ ও সঞ্চয় যত বৃদ্ধি পাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কর বা রাজস্ব আয়ের ওপর নির্ভরশীলতা ততহ্রাস পাবে, ফলশ্রুতিতে পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা তত বৃদ্ধি পাবে। তাই একটি জাতির অর্থনৈতিক উন্নতি, মুক্তি ও সমৃদ্ধির জন্য অধিকতর মিতব্যয়িতার অভ্যাস এবং সঞ্চয়ী দৃষ্টিভঙ্গি সরকারের একটি অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ আজ বিশ্বের দরবারে রোল মডেল। কিন্তু এই পথ পাড়ি দিয়ে আসতে বাংলাদেশকে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে এবং এখনও করে যাচ্ছে। আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে এখনও ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে এ দেশের খেটে খাওয়া শ্রমিক, দেশের জন্য ফসল ফলানো কৃষক, পোশাক শিল্পের কর্মী ও বিদেশের মাটিতে কর্মরত রেমিটেন্স পাঠানো ভাইয়েরা। পাশাপাশি, দেশের কল্যাণে নিবেদিত বহু পেশাজীবী মানুষও দেশকে এগিয়ে নিতে কাজ করে যাচ্ছে। যেখানে জাতি হিসেবে আমরা পরিশ্রমী, ত্যাগী এবং কৃচ্ছ্রতানীতিতে বিশ্বাসী সেখানে স্মার্টনেস-এর দোহাই দিয়ে, ক্ষমতা, অর্থ-বিভব প্রদর্শনের নামে রাষ্ট্রীয় সম্পদ অপচয়-অপব্যয় কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। অপচয়কারীরা নিজের জন্য তো নয়ই; সমাজ, পরিবার ও জাতির জন্যও কিছু করতে পারে না, তাই অপচয়কারীদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে বয়কট করা উচিত। পরিশেষে, ২০৪১ সালের 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়ে আমাদেরকে আগে স্মার্ট নাগরিক হতে হবে এবং তা নির্ভর করে মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষায় আলোকিত হয়ে সর্বপ্রকার লোভ-লালসামুক্ত হয়ে পরিবার ও রাষ্ট্রের কল্যাণে সবাইকে মিতব্যয়ী হওয়া।

ড. এন. এইচ. এম. রুবেল মজুমদার: সহযোগী অধ্যাপক, ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর, rubel.infs@gmail.com

অর্থনীতিতে বাংলাদেশ বিশ্বে ৩৫তম

অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ৩৫তম অবস্থানে রয়েছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। ২রা সেপ্টেম্বর কুমিল্লার লালমাই উপজেলায় 'নলেজ পার্ক'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান। মন্ত্রী বলেন, এক সময় অর্থনৈতিক সূচকে বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যেত না। এখন বিশ্ব আমাদের অসাধারণ বিপ্লবী দেশ বলে চেনে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সাল থেকে গত ১৪ বছরে বাংলাদেশের আমূল পরিবর্তন এসেছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, কুমিল্লার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় হাজার হাজার শিক্ষার্থী রয়েছেন। এই তরুণদের যদি আমরা আইসিটিতে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি তাহলে এ অঞ্চলের অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন আসবে। ১৫ বছর আগেও দেশের স্বল্প শিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম কর্মসংস্থানের জন্য যেখানে গার্মেন্টসসহ অন্যান্য শ্রমনির্ভর শিল্পের ওপর নির্ভরশীল ছিল, সেখানে বর্তমানে তারা আইটি শিল্পে নিজেদের ক্যারিয়ার গড়ছে।

প্রতিবেদন: পারিজাত রানী শ্রেয়সী

শিশুর মনের যত্ন

খালেদা বেগম

হেমন্তের হালকা কুয়াশাময় রোদেলা সকালে নাফিজার বারান্দায় টবের গাছগুলো ঝকঝক করছে। সবুজ সবুজ পাতায় লেগে থাকা পানিগুলোর ফোটা তো নয় যেন হীরের টুকরো। টবের গাছগুলো যেন নাফিজার নিজের ছেলেমেয়ের মতো। সকালের ইবাদত ও নাশতা তৈরির পর নাফিজার কাজ হলো গাছে পানি দেওয়া। গোড়ায় দেওয়ার পাশাপাশি গাছের পাতায়ও কিছু পানি ছিটিয়ে দেয় সে। ভোরে স্বামী, দুই সন্তানসহ সবাই ফজরের নামাজ ও কোরান তেলাওয়াতের পর নাফিজার স্বামী, মেয়ে হাফসা ও ছেলে নুরকে শিশুদের প্রতি নবীজীর ভালোবাসার গল্প শোনান। নাশতা তৈরির জন্য রান্নাঘরে যান নাফিজা । আর তার স্বামী ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিছানাপত্র গোছানোর পর তাদের বারান্দায় যান। গত কয়েক দিন যাবৎ পারিবারিক ও দাপ্তরিক নানা ঝামেলায় নাফিজা ও তার স্বামী গাছগুলোর তেমন যত্ন নিতে পারেননি। কিছু পাতা মরে গেছে, টবের নীচেও ময়লা জমেছে প্রচুর।

হাফসা ও নুর খুবই উৎসাহের সাথে বাগান পরিষ্কারে হাত লাগায়। তারা পুরোনো গাছগুলো যত্নের পাশাপাশি ৩টি টব ও ২টি ড্রামে কিছু শাকসবজির বীজও বুনে। রান্নাঘর থেকে এক ফাঁকে নাফিজা এসে হাঁক দেয়, 'এই যে, চাষিকুল আপনাদের নাশতা রেডি'। তাড়াতাড়ি হাত-পা ধুয়ে টেবিলে আসেন। নাশতার টেবিলে বাচ্চারা খুবই উচ্ছ্বসিত হয়ে মাকে তাদের বাগান পরিচর্যার কথা শুনালো। সন্ধ্যায় দু'ভাইবোন মিলে টেলিফোনে নানি, দাদি ও কাজিনদের সে গল্প বলল। চাকরিজীবী মা হলেও অফিস ও সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে নাফিজা চেষ্টা করেন ছেলেমেয়েকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে। তার স্বামীও এ ব্যাপারে কোনোরূপ কার্পণ্য করেন না। তারা জানেন শিক্ষা বলতে শুধুমাত্র প্রথাগত স্কুল-কলেজের লেখাপড়া নয় বরং প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য একজন শিশুর প্রয়োজন শারীরিক ও মানসিক উভয় দিকের বিকাশের।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট-এর শিশু কিশোর ও পারিবারিক মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদের মতে, মানসিক বিকাশের ৩টি পর্যায় যথা : প্রথমত ধারণাগত অর্থাৎ জন্মের পর থেকে আশপাশের বস্তু ও মানুষ সম্পর্কে যে ধারণা হয়; দ্বিতীয়টি তার ভালো-মন্দ জানা অর্থাৎ নৈতিকতার বিকাশ; আর তৃতীয়টি হলো সামাজিক শিক্ষা। শিশুর বিকাশ এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভাব প্রসঙ্গে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন যে, একটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে কীভাবে সে দেশের শিশুরা প্রতিপালিত হয়। সত্যিই, আজকের শিশুরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠলে আগামী দিনের বিশ্ব হবে সুন্দর, শান্তিময় ও সমৃদ্ধশালী।

শিশুর বেড়ে ওঠার সঠিক পরিবেশ নিশ্চিত করা ও তাদের অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর বিশ্বের প্রায় সব দেশে ২০শে নভেম্বর পালিত হয় 'বিশ্ব শিশু দিবস'। বাংলাদেশে ১লা অক্টোবর শিশু দিবস ও অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে শিশু অধিকার সপ্তাহ হিসেবে পালিত হয়। ২০২৩ সালে দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল 'শিশুদের জন্য বিনিয়োগ করি, ভবিষ্যতের বিশ্ব গড়ি'। ১৯৯৭ সাল থেকে ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। তদানীন্তন সরকার শিশুদের কথা চিন্তা করে 'শিশু আইন ১৯৭৪' প্রণয়ন করে। তারই ধারাবাহিকতায় সরকার শিশু অধিকার সংরক্ষণ, শিশুর প্রতিভা বিকাশে সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনাসহ শিশুশ্রম ও নির্যাতন বন্ধ, বিশেষ করে কন্যা শিশুদের প্রতি বৈষম্য বিলোপ সাধনে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ইতোমধ্যে সরকার 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০' ও 'জাতীয় শিশুনীতি ২০১১', 'শিশু আইন ২০১৩', 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭' প্রণয়ন করেছে। এসব আইন, নীতি ও পদক্ষেপ শিশুর শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশসহ সার্বিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বিশ্বব্যাপী শিশুদের জন্য একটি সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য রয়েছে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ। এটি ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ১৯৯০ সাল থেকেই এটি আন্তর্জাতিক আইনের একটি অংশে পরিণত হয়। সনদটি বিশ্বব্যাপী শিশু অধিকার বাস্তবায়নে একটি রক্ষাকবচ। জাতিসংঘের ১৯৬টি চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে প্রথম সারিতে। এর ৫৪টি ধারায় নির্ধারিত হয়েছে শিশুদের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য এবং সাংস্কৃতিক অধিকার। শিশুর সবগুলো অধিকার সনদটি ৪টি প্রধান শিরোনামে ভাগ করা হয়েছে যেগুলো হলো: বেঁচে থাকা, বিকাশ লাভ করা, সুরক্ষা লাভ এবং অংশগ্রহণের অধিকার করার ক্ষমতা।

শিশুর মানসিক বিকাশের সবচেয়ে বড়ো আধার হলো পরিবার। পিতামাতার মায়ামমতার আবরণের মধ্যে শিশু পায় নিরাপত্তা বোধ, যা তাকে জীবনের অন্য সকল দিকে সহজে মনোঃসংযোগ করতে সহায়তা করে। অন্যদিকে পারিবারিক কলহ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অপর্যাপ্ত বা অত্যধিক খাবার, ঘনঘন স্কুল বদল ইত্যাদি কারণসমূহ শিশুর মানসিক বিকাশের অন্তরায়। মানব শিশু জন্মের পর থেকে নানারকম পরিচর্যার মধ্যে দিয়ে পরিপূর্ণ মানুষ রূপে বিকশিত হয়। এ বিকাশ দু'রকমের–শারীরিক ও মানসিক। সঠিক ও সুষম খাদ্য, খেলাধুলা, শরীর চর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে যেমন শিশুরা পায় একটি সুগঠিত ও সুস্থ শরীর তেমনি পিতামাতার স্নেহ, একটি সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ, সুস্থ সামাজিকতা, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটে। তার মধ্যে গড়ে ওঠে মানবিকতা ও সৃজনশীলতা। পৃথিবীতে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ ইত্যাদির পার্থক্য করতে শিখে। সত্য কোনটা আর মিথ্যা কোনটা তা নিয়ে মনে কোনো সংশয় তো থাকেই না বরং প্রয়োজনে সত্যের পক্ষে লড়াই করতেও দ্বিধা করে না। আদর, স্নেহ, গল্প বলা, শিশুর সাথে খেলা করা, গান শোনানো, নম্র, ভদ্র আচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু বেড়ে ওঠে আত্মবিশ্বাস নিয়ে। খেলাধুলা বা শারীরিক পরিশ্রম বাচ্চাদের শারীরিক গঠনের পাশাপাশি মানসিকভাবেও রাখে উৎফুল্ল। শিশুদের মানসিক বিকাশে পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক, প্রতিবেশী সকলেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

পরিপূর্ণ বিকশিত শিশুরা বেড়ে ওঠে সামাজিক দক্ষতা নিয়ে। আদবকায়দা, অপরকে সম্মান প্রদর্শন, জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ, অন্যকে না ঠকানো, মিথ্যা, ছলনা, ভাওতাবাজি ও খারাপ সঙ্গ থেকে দূরে থাকা– এ সমস্ত মনুষ্যত্ববোধ নিয়ে বেড়ে ওঠার জন্য শক্তিশালী পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ থাকা অতি জরুরি। বাবা-মা এবং পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের কখনই ছোটোদের সামনে মিথ্যা কথা বলা বা রূঢ় আচরণ করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীসহ সমাজের মুরুব্বিগণেরও ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মানসিকভাবে পরিপক্ব শিশুরা পড়ালেখার ব্যাপারেও হয় আন্তরিক। নিজ দায়িত্বে নির্দিষ্ট সময়ে পড়তে বসা, বাড়ির কাজ শেষ করা, স্কুলে বন্ধুদের সাথে ভদ্র আচরণ, শিক্ষকদের মান্য করা, ক্লাসে মনোযোগ দেওয়া– সবই মানসিক সুস্থতার লক্ষণ। এসব গুণাগুণ শুধু যে পরিবার থেকে শিশু গ্রহণ করবে তা নয়, বরং বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও ছাত্রছাত্রীদের মনোজগৎ উন্নয়নে গ্রহণ করবে বিভিন্ন সৃজনশীল পদক্ষেপ। এর ফলে লেখাপড়ার পাশাপাশি শিশুরা বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবে। বিদ্যালয়ে শিশুরা পড়াশুনার পাশপাশি বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কাজ যেমন : খেলাধুলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ছবি আঁকা, নিউজপেপার ক্লাব, গণিত ক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাব, পরিবেশ রক্ষা ক্লাবসহ নানারকম কাজে সম্পৃক্ত হতে পারে। এতে করে শিশুদের জ্ঞানের জগৎ সম্প্রসারিত করার পাশাপাশি স্কুল সময়টা হয় আনন্দদায়ক।

পরিবারে শিশুরা শুধু যে আদর-ভালোবাসা পাবে তা নয় বরং বাচ্চাকে আদর-স্নেহ দেওয়ার পাশাপাশি তাকে দায়িত্ব নিতেও শেখাতে হবে। শিশুর যে-কোনো কাজ হোক তা অতি ক্ষুদ্র হলেও সে কাজের মূল্যায়ন করতে হবে। এতে করে শিশু তার কাজে উৎসাহ পাবে এবং তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে। ছোটোবেলা থেকেই তাদের ছোটোখাটো কাজ যেমন নিজের কাপড়, জুতো, বই-খাতা, বিছানাপত্র গোছানো ইত্যাদি শেখানো যেতে পারে। ছেলেমেয়ে আরেকটু বড়ো হলে ঘরের অন্যান্য কাজ যেমন– রান্না, খাবার পরিবেশন, বাজার করা ইত্যাদিতে সাহায্য করতে পারে। ঘরে যদি কোনো বয়স্ক সদস্য থাকে তাদের প্রতি খেয়াল রাখা, ছোটোদের যত্ন নেওয়া, মাঝে মাঝে ফোন করে আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীদের খবর নেওয়ার মাধ্যমেও শিশু-কিশোরদের পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, যেসব কাজে শিশুদের বাধা দেওয়া হয় শিশুরা সেসব কাজ আরও বেশি করে করতে চায়। সেজন্য শিশুর খারাপ কাজসমূহের প্রতি খুব বেশি দৃষ্টি না দিয়ে ভালো কাজে তাদের উৎসাহ দিতে ও সংযুক্ত করতে হবে। ড. হেলালের মতে, সন্তানের সাথে বাবা-মার সম্পর্ক হবে বন্ধুর মতো। তাই বলে ছেলেমেয়েকে খুব বেশি স্বাধীনতাও দেওয়া যাবে না। এ সম্পর্কটি একটি ঘুড়ি উড়ানোর মতো। ঘুড়ি বেশি উড়তে দিলে ঘুড়ি কাটা পড়ে হারিয়ে যায়। আবার লাটাইটা বুকের সাথে এমন শক্ত করে আগলেও রাখা যাবে না যে ঘুড়ি উড়তেই পারল না। বরং লাটাই একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে রেখে পরিমাণ মতো সুতা ছাড়লেই ঘুড়ি আকাশে ভালোভাবে উড়তে পারবে।

ছাত্রাবস্থায় স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা বিতর্ক অনুষ্ঠান, ছোটো পরিসরে আলোচনাসভা, শান্তিপূর্ণ মিছিল ইত্যাদি নানারকম জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশু অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন সংস্থা ও গণমাধ্যম কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক এসব কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শিশুরা তো ছোটো, ওদের আবার রাজনৈতিক সচেতনতা কী? কথা হচ্ছে শিশুদের অধিকার নিয়ে! রাজনীতি জনমানুষের অধিকার আদায়ের একটি অন্যতম মাধ্যম। আজকের শিশুরাই আগামী দিনের নাগরিক। তাদের হাতে পরিচালিত হবে রাষ্ট্রের গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ সর্বোপরি পুরো সরকার ব্যবস্থা। রাজনৈতিক সচেতনতা একদিনে আসে না। ছাত্রাবস্থা থেকে এর চর্চা করতে হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬'র ছয় দফা, ১৯৬৯'র গণ-অভ্যুত্থানসহ সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিল ছাত্রসমাজ। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধেও ছিল তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে রাজনীতির ব্যাপারে বেশ অনীহা দেখা যায়, যা ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য মোটেই সুখের খবর নয়। তাই শিশুদের মনে স্কুল বয়স থেকেই সুস্থ রাজনীতির বীজ বপন করতে হবে, যাতে করে তারা ভবিষ্যতকে দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

এ বিষয়ে উল্লেখ করা যায় ইউনিসেফ ঢাকা ২০১৯ সালে জাতিসংঘ শিশু সনদ-এর ৩০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায়

একটি আলোচনাসভার আয়োজন করে, এতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বি মিয়া এবং শিশু অধিকার বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সভাপতি শামসুল হক টুকু এমপি উপস্থিত ছিলেন। সভাটির আগে বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ যৌথভাবে দেশের ৩০০ সংসদীয় নির্বাচনি এলাকার নির্ধারিত শিশুদের সঙ্গে শিশু অধিকার বিষয়ক আটটি বিভাগীয় জাতিসংঘ সনদ ফোরামের সংলাপ আয়োজন করে। সংলাপসমূহে শিশুরা তাদের নিজ নিজ সংসদীয় এলাকার আইন প্রণেতাদের সাথে মতবিনিময় ও তাদের দাবিদাওয়াসমূহ তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছিল।

কিডস রাইটস্ নামের একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা বিভিন্ন দেশের শিশু অধিকার ২০২০ সালে বিশ্বের ১৮২টি দেশের শিশুদের অধিকার বিষয়ে ৫টি সূচকের ভিত্তিতে একটি তালিকা প্রণয়ন করে (ইউএনডিবি, ইউনেস্কো ও ইউনিসেফ-এর প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে)। সূচকসমূহ হলো : বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সুরক্ষার অধিকার এবং সকল অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করতে সময় এমন একটি পরিবেশ পাওয়ার অধিকার।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে জাপানের শিশুরা সবচেয়ে ভালোভাবে বেড়ে ওঠে। জাপানে প্রতিটি শিশু জন্মের পর তার অভিভাবককে সরকারি তহবিল থেকে এককালীন ৫ লাখ ইয়েন প্রদান করা হয়। তাছাড়া প্রতিমাসে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিটি শিশুকে (বিদেশি শিশুসহ) প্রায় ১৫ হাজার ইয়েন মাসিক ভাতা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের মতোই জাপানে জুনিয়র হাইস্কুল পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ ও অবৈতনিক শিক্ষা সুবিধা দেওয়া হয়। স্কুলসমূহে রয়েছে বিনামূল্যে টিফিন সুবিধা। এছাড়া ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের পথ্যসহ বিনামূল্যে চিকিৎসা সহায়তাও প্রদান করে সে দেশের সরকার। জাপানে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাজীবনের প্রথম দিনে অভিভাবক, স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের প্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সিনিয়র শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ তাদের বরণ করে নেয়। প্রাথমিক শিক্ষার পূর্বে এক থেকে পাঁচ বছর বয়সে ডে-কেয়ার সেন্টারে থাকার সময়ে শিশুরা খেলাধুলার মাধ্যমে একে অপরকে সহযোগিতা, মনুষ্যত্ববোধ, ত্যাগ, শৃঙ্খলা, সততা, বিনয়, শিষ্টাচার সৌন্দর্যবোধ ও নৈতিক চেতনার শিক্ষা নেয়। মনোবিকাশের এ শিক্ষা জাপানি শিক্ষাব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য। যার কারণে জাপানিদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার হার প্রায় শূন্যের কোঠায়।

শিশুর অধিকার নিশ্চিতকল্পে গণমাধ্যমও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। শিশু বিষয়ক নাটক, চলচ্চিত্র, গঠনমূলক আলোচনা অনুষ্ঠান, কার্টুন, পোস্টার, রচনা, ছড়া, সংবাদ প্রচার ও প্রকাশের মাধ্যমে গণমাধ্যম শিশুর মনোজগৎ বিকাশ ও মনন গঠনে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। তবে, শিশুদের বিষয়টি যেহেতু খুবই স্পর্শকাতর, তাই উপোরিল্লিখিত অনুষ্ঠান বা প্রকাশনার কন্টেন্টের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। উল্লেখ্য, শিশুদের ওপর নীতিভিত্তিক রিপোর্টিংয়ে জাতিসংঘ ও ইউনিসেফের দিক নির্দেশনা হলো যে-কোনো অবস্থায় শিশু অধিকার ও মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখতে হবে। যাতে প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা ও শিশু সম্পর্কিত তথ্যের গোপনীয়তা সুরক্ষিত থাকে।

শিশুরা এ পৃথিবীতে আসবে নিরাপদে; বেড়ে উঠবে সুস্থভাবে; তার কর্ম হবে স্বতঃস্ফূর্ত; জীবন হবে বৈচিত্র্যময় ও আনন্দপূর্ণ। পরিপূর্ণ বিকশিত একটি মানব সন্তান নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য যেমন আনন্দদায়ক ও কল্যাণকর সময় উপহার দেয় তেমনি সমাজের কাছে তিনি একজন সম্পূর্ণ এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। একটি শিশু সঠিকভাবে বিকশিত হয়ে একদিন রূপান্তরিত হবে একজন পরিপূর্ণ মানব সন্তানে। পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত একটি ফুলের সৌন্দর্যে যেমন জগৎ হয় আলোকময় ও রঙিন, সুঘ্রাণে ভরে ওঠে চারদিক, তেমনি একজন সৎ ও কর্মঠ মানুষের দ্বারা তার পরিবার হয় সুখী, সমাজ হয় উপকৃত এবং এমন শত-হাজারো মহৎ প্রাণের কর্মচাঞ্চল্যে জগৎ হয় কল্যাণময় ও শান্তিপূর্ণ। সুতরাং আগামীর সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য শিশুর শারীরিক ও মানসিক পরিপূর্ণ বিকাশের কোনো বিকল্প নেই।

খালেদা বেগম: সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, bkhaleda9@gmail.com

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সাফল্যে বাংলাদেশকে পুরস্কৃত করল যুক্তরাজ্য

শক্তিশালী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবন বাঁচাতে ভূমিকা রাখায় বাংলাদেশকে ৫ লাখ পাউন্ড পুরস্কার দিয়েছে যুক্তরাজ্য। এই অর্থ দুর্যোগের আগে এবং পরে বাংলাদেশ সরকার, দাতা সংস্থা, জাতিসংঘ এবং এনজিওদের কাজে সমন্বয় করতে সহায়তা করবে। এই অর্থ যেন অতি জরুরি ত্রাণ প্রয়োজনে এবং সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের কাছে পৌঁছানো হয় সেটিও তারা নিশ্চিত করবে বলে জানিয়েছে। ৩রা সেপ্টেম্বর গণমাধ্যম থেকে এসব তথ্য জানা যায়।

যুক্তরাজ্যের সরকারি ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, তারা বাংলাদেশ সরকারকে ভূমিকম্পের জন্য নতুন ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং আকস্মিক পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবে, সেইসঙ্গে দুর্যোগ আঘাত হানার আগে জনগণ যেন সঠিক পূর্বাভাস পেয়ে তাদের জীবন রক্ষার জন্য সতর্ক ব্যবস্থা নিতে পারে সে বিষয়ে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে।

যুক্তরাজ্যের উন্নয়ন পরিচালক ও বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনার ম্যাট ক্যানেল বলেন, গত বছর সিলেটে এবং এ বছর চট্টগ্রাম বিভাগে ভয়াবহ বন্যা দেখিয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশ কতটা দুর্বল। তাই বাংলাদেশে বৃহত্তর দুর্যোগ প্রস্তুতি, প্রতিক্রিয়া এবং পুনরুদ্ধারের জন্য জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী অফিসের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করতে পেরে যুক্তরাজ্য গর্বিত। আমি বাংলাদেশ সরকার এবং ইউএনডিপির দুর্যোগ প্রতিরোধ সপ্তাহের সময় এটি ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক গউইন লুইস বলেন, যুক্তরাজ্যের সঙ্গে অংশীদারিত্ব বাংলাদেশে জাতিসংঘ এবং এনজিওগুলোর মধ্যে সমন্বয় বাড়াবে। ফলস্বরূপ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সমর্থন জোরদার হবে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরাও সহায়তা পাবে।

প্রতিবেদন: ফারিহা মরিয়ম

খাদ্য নিরাপত্তা ও বাংলাদেশ

রেজাউল করিম সিদ্দিকী

প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী ইংরেজ শাসন এবং ২ দশকের বেশি পাকিস্তানি শাসন শোষণের যাতাকলে পিষ্ট দারিদ্র্যপীড়িত অপুষ্টির শিকার ও খাদ্য নিরাপত্তাহীন বাঙালি জাতির জন্য স্বাধীনতা উত্তরকালে খাদ্য নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর পর ১৯৭৪ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে নীতি নির্ধারকদের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়া ২০০৭-২০০৮ সালের বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকটের সময় খাদ্যশস্য, জ্বালানি ও সারের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয়। স্বাধীনতার পর পর এদেশের খাদ্য চাহিদার বেশির ভাগ পূরণ হতো বৈদেশিক খাদ্য সহায়তা বিশেষ করে পিএল ৪৮০-এর আওতায় আমদানিকৃত খাদ্য দ্রব্যের মাধ্যমে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সালে খাদ্য সাহায্য হিসাবে বাংলাদেশে ১.৩ মিলিয়ন টনের বেশি খাদ্য সাহায্য আসে, যা মোট আমদানির ৩৫ শতাংশেরও বেশি। ২০০৫ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ (HIES)-এর তথ্য অনুযায়ী দেশের চল্লিশ শতাংশ দরিদ্র মানুষ তাদের আয়ের ৭০ শতাংশ শুধুমাত্র খাবারের জন্য ব্যয় করত। তা সত্ত্বেও জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ দিনে ১৮০৫ কিলো ক্যালরির কম খাবার গ্রহণ করত একজন মানুষের দৈনিক ন্যূনতম খাদ্য চাহিদা ২১২২ কিলো ক্যালরির প্রায় ৮৫%।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক খাদ্য সাহায্য কমতে থাকে। ফলে খাদ্য ঘাটতি পূরণে সরকার আমদানিকৃত খাদ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু ২০০৭-২০০৮ সালের বৈশ্বিক খাদ্য সংকট এবং খাদ্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি প্রমাণ করে যে খাদ্য ঘাটতি পূরণে আমদানি নির্ভরতা কোনো স্থায়ী সমাধান নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বণ্টন ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সরকারের এসব পদক্ষেপের ফলে সাম্প্রতিক করোনা মহামারির অভিঘাত ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটেও বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্বাভাবিক রাখতে সক্ষম হয়েছে।

সাধারণভাবে খাদ্য নিরাপত্তা বলতে একটি স্বাস্থ্যকর ও উৎপাদনমুখী জীবনযাপনের জন্য দেশের সকলের সকল সময়ে পর্যাপ্ত খাদ্যের লভ্যতা ও প্রাপ্তির সুযোগ থাকাকে বোঝায়। তবে খাদ্য নিরাপত্তাকে জাতীয় ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথকভাবে সংজ্ঞায়িত করা উচিত। জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বলতে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত থাকাকে বোঝায়। অন্যদিকে ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে নিজস্ব উৎপাদন, বাজার অথবা সরকারি সরবরাহ থেকে সমাজের সকলের জন্য খাদ্য চাহিদা পূরণের সুযোগ থাকাকে বোঝায়।

কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নতি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত। বন্যা, সাইক্লোন, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রায়শ এদেশের খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পায়। মাত্র ১ লক্ষ ৪৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের দেশে ১৬ কোটির বেশি লোকের বাস। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। উপরন্তু বসতবাড়ি, কলকারখানা, রাস্তাঘাটসহ বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে প্রতিবছর এ দেশে ১% হারে কৃষিজমি হ্রাস পাচ্ছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে ২০৩০ সাল নাগাদ বছরে ১.২ মিলিয়ন টন ধান উৎপাদন হ্রাস পাবে– যা বার্ষিক ধান উৎপাদন প্রায় চার শতাংশ। ২০০৭-২০০৮ সালের খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি থেকে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, খাদ্যশস্যের মূল্য ও জোগানের স্থিতিশীলতার জন্য বিশ্ব বাজারের উপর আর নির্ভর করা যায় না। ফলে এ দেশের ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তা যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার স্বনির্ভরতা (Self Reliance) থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা (Self Sufficiency) নীতি গ্রহণ করেছে।

সময়োপযোগী ও কার্যকর এসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশ খাদ্য উৎপাদনে ধারাবাহিক সফলতা অর্জন করেছে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়েছে।

উৎপাদন বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি উন্নত জাতের শস্য ও তার চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন, এদের বিস্তার, প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা, সার, কীটনাশক, বীজ ও আনুষঙ্গিক কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা। এজন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় কৃষি গবেষণা ব্যবস্থায় (NARS) ৫০০-এর বেশি উন্নত জাতের শস্য ও তাদের চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। কম ফলনশীল স্থানীয় জাতের পরিবর্তে এসব উন্নত জাতের ফসল আবাদ করায় ফলন বেড়েছে, উৎপাদন খরচ কমেছে এবং লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডিজেল ইঞ্জিন আমদানি উদারীকরণ, আমদানি শুল্ক হ্রাসকরণ, ক্ষুদ্র সেচ যন্ত্রপাতি বিশেষ করে অগভীর নলকূপের উপর থেকে স্ট্যান্ডারডাইজেশন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার ইত্যাদি কারণে

ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রমে বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ ও ডিজেলের মাধ্যমে সেচ কার্যে ভরতুকি প্রদান করায় কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৯৯ সালে সরকার বেসরকারি খাতকে হাইব্রিড ধানের বীজ আমদানির সুযোগ দেয়। ফলে উচ্চ ফলনশীল জাতের হাইব্রিড ধানের বীজের বাজার উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। স্যারের বিপণন ব্যবস্থা বেসরকারিকরণ করা হয় ১৯৭৮ সালে, যা আশির দশকে সম্প্রসারিত হয়। ১৯৮৭ সাল থেকে বেসরকারি ডিলারদেরকে ফ্যাক্টরি ও বিএডিসি সরবরাহ কেন্দ্র হতে হ্রাসকৃত মূল্যে সার সংগ্রহ ও বিপণনের অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৯৫ সালে বোরো মৌসুমে অভ্যন্তরীণ বাজারে সারের তীব্র সংকট দেখা দেয়। ফলে ১৯৯২ সালে প্রত্যাহারকৃত নন-ইউরিয়া সারের উপর ভরতুকি পুনরায় চালু করা হয়। বর্তমান অবধি সরকার ট্রিপল সুপার ফসফেট (TSP) ও মিউরেট অফ পটাশ (MP) সারে অধিক পরিমাণে ভরতুকি প্রদান করছে। এর ফলের রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে, জমির উর্বরতা ও খাদ্যশস্যের উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার গত ১৫ বছরে এদেশে কৃষি খাতে যে ধারাবাহিক উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে তা সত্যিই অকল্পনীয়। খাদ্য ঘাটতি নিয়ে স্বাধীনতা লাভ করা বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব সরকারই কমবেশি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু বিগত ১৫ বছরে কৃষি ক্ষেত্রে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছে তা অতীতের যেকোনো সময়ের সফলতা ও অগ্রগতির চেয়ে অনেক গুণ বেশি। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে দেশে চালের মোট উৎপাদন ছিল ৩ কোটি ১৩ লক্ষ টন। এ সময় দেশে গম, ভুট্টা, আলু ও সবজির মোট উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৮ লক্ষ ৪৯ হাজার, ৭ লক্ষ, ৫ লক্ষ ও ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন। কৃষি খাতে প্রয়োজনীয় ভরতুকি ও প্রণোদনা প্রদান, প্রয়োজনীয় সার, বীজ, কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতির সহজলভ্যকরণ, কৃষির আধুনিকীকরণ, উন্নত জাতের ফসল ও তার চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য ধারাবাহিক গবেষণা, কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবা প্রদান ইত্যাদি কারণে গত ১৫ বছরে এসব খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৪৫ পারসেন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৪ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৮ হাজার মেট্রিক টনে এসে দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে ভুট্টা, আলু ও সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৬৪ লক্ষ, ১ কোটি ৪ লক্ষ ও ২ কোটি ২০ লক্ষ মেট্রিক টনে এসে দাঁড়িয়েছে। এ সময়ের মধ্যে কৃষিপণ্য বিশেষ করে খাদ্যশস্য বিপণন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং বিতরণ ব্যবস্থাও শক্তিশালী করা হয়েছে। নিয়মিত বাজার মনিটরিং-এর মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফা লাভের প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। বাজার ব্যবস্থায় একচেটিয়া ফরিয়াদের দৌরাত্ম্য প্রতিহত করতে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)'র মাধ্যমে সারা দেশে পাঁচ কোটি মানুষকে সাশ্রয়ী মূল্যে চাল, ডাল, আটা, চিনি, ভোজ্যতেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে।

যে-কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামগ্রিক উন্নয়নের প্রথম ধাপ জ্বালানি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এজন্য স্বাধীনতা পরবর্তী সময় দেশের সকল সরকার কমবেশি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার একে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে সর্বাত্মক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে এবং তার সফল বাস্তবায়ন করেছে ও করছে। সকল স্তরের জনগণ ইতোমধ্যেই এর সুফল ভোগ করছে। আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে এই সাফল্য, উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

রেজাউল করিম সিদ্দিকী: জনসংযোগ কর্মকর্তা, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, rezaulkarim_siddiquee@yahoo.com

প্রথম বাঙালি নারী চিকিৎসক ডা. কাদম্বিনী গাঙ্গুলী

ড. মোহাম্মদ আলী খান

ডা. কাদম্বিনী গাঙ্গুলী প্রথম বাঙালি নারী ডাক্তার। শুধু এই কৃতিত্ব শেষ কথা নয়। রেকর্ডের স্বর্ণকন্যার ধ্রুপদী উপস্থাপনায় সৃষ্টি হয়েছে ইতিহাসের মাইলফলক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এন্ট্রান্স পাস করা প্রথম ছাত্রী কাদম্বিনী বসু (১৮৭৯), এফ.এ. পাস করা প্রথম দুজন ছাত্রীর মধ্যে একজন (১৮৮০)। সমগ্র ভারতবর্ষে তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তিনি ও চন্দ্রমুখী বসু প্রথম নারী গ্র্যাজুয়েট (১৮৮২), কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া প্রথম ও একমাত্র ছাত্রী (১৮৮৩) এবং পাস করা প্রথম নারী চিকিৎসক, বিলাত থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় ট্রিপল ডিগ্রি আনা প্রথম বাঙালি নারী চিকিৎসক (১৮৯৩)।

তিনি পরবর্তী প্রজন্মের নারীদের জন্য খুলে দিয়েছেন বদ্ধ দুয়ার, ভেঙে ফেলেছেন অচলায়তন। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ছিলেন সময় অতিক্রমী (Time advanced) ব্যতিক্রমধর্মী নারী। ডা. কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর তুলনা ডা. কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।

ডা. কাদম্বিনী বসুর (বিয়ের পর কাদম্বিনী গাঙ্গুলী) পৈত্রিক নিবাস বরিশালের গৌরনদীর চাঁদশী। তাঁর জন্ম ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে, জীবনকাল ৬২ বছর। পিতার নাম শ্রী ব্রজকিশোর বসু, তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী। কাদম্বিনী বসুর মাতার নাম জানা যায়নি। ডা. কাদম্বিনীর স্বামী দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর জন্মস্থান মাগুরখণ্ড, বিক্রমপুর/ মুন্সিগঞ্জ, তিনিও ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কাদম্বিনী বসুর জন্মস্থান বরিশালের গৌরনদীর চাঁদশী, মতান্তরে বিহারের ভাগলপুর, তবে পৈত্রিক নিবাস (চাঁদশী, গৌরনদী, বাংলাদেশ) নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই।

ডা. কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ৩রা অক্টোবর ১৯২৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এই বছর (২০২৩) তাঁর মৃত্যুশতবার্ষিকী। শতাব্দীর সীমানা পেরিয়ে তিনি আজও আলোর দ্যুতি ফেলে, জ্ঞান ও সাধনার প্রদীপ জ্বালিয়ে আমাদের আপ্লুত করেন। নিম্নে ডা. কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলী)'র জীবনের সংক্ষিপ্ত কালপঞ্জি প্রদত্ত হলো:

কাদম্বিনী বসু ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ভাগলপুর থেকে এসে কলকাতার হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তখন কিশোরী কাদম্বিনী বসুর বয়স ১৩ বা ১৪ বছর। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের অবলুপ্তির পর নবগঠিত বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের প্রথম দিন (১.৬.১৮৭৬) থেকেই তিনি ছাত্রী। ১৮৭৭ সালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী কাদম্বিনী বসু ২৫০ নম্বরের মধ্যে ১৫১ নম্বর পেয়ে প্রথম হন। তখন থেকেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় বেথুন স্কুলের সাথে মিশে গেলে কাদম্বিনী বসুও সেই স্কুলের ছাত্রী হয়ে যান (১৮৭৮ খ্রি.)।

উল্লেখ্য, হিন্দু ফিমেল স্কুল পরবর্তী সময়ে বেথুন স্কুল নামে পরিচিতি লাভ করে। হিন্দু ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠায় ছিলেন জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন [John Elliot Drinkwater Bethune (1801-1851)], রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ। এই স্কুল প্রতিষ্ঠা ছিল কলকাতা তথা বাংলায় নারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক মাইলফলক– যা নারীশিক্ষা আন্দোলনে অসাধারণ গতি লাভ করে। বেথুন সাহেব পরলোক গমন করেন ১২ই আগস্ট ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৮৪৮ সালে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত স্কুলের উন্নতির জন্য আন্তরিক চেষ্টা করে গেছেন এবং মৃত্যুর আগে তাঁর যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এই স্কুলকে দান করে যান। এই হিন্দু ফিমেল স্কুলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বেথুন স্কুল।

নতুন-পুরাতন ছাত্রীদের নিয়ে বেথুন স্কুল আরও উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। এবারের লক্ষ্য মেয়েদের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নেই। এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত হলেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ এখনও হয়নি। বর্তমান সময়ের আলোকে এসব চিন্তারও বাইরে; অথচ কাদম্বিনী বসুদের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। কিন্তু কাদম্বিনী বসু তো থেমে থাকতে আসেননি, তিনি তো ইতিহাস সৃষ্টি করতে এসেছেন। তাঁকেই মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বন্ধ দরজাটা খোলার দায়িত্ব নিতে হলো। অবশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের টনক নড়ে। ১৭ই মার্চ ১৮৭৭ সালের সিনেট সভায় মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসার প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়।

এদিকে রক্ষণশীল সমাজপতিরা বসে থাকেননি। *সমাচার চন্দ্রিকা* পত্রিকা লিখল (২২.১১.১৮৭৭ খ্রি.): 'গত বর্ষ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় রমণীরা লব্ধাবকাশ হইয়াছেন।... আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নহি। কিন্তু তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লইয়া যে কি ফল হইবে, বলিতে পারি না। বাঙালী মেয়েরা কি বি.এল. পরীক্ষা দিয়া আদালতে ওকালতি করিবেন? আমরা দেখিতেছি ইংরাজি সভ্যতা প্রবেশ করাতে এদেশের সর্ব্বনাশ হইল।' কিন্তু শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধীনে এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন কাদম্বিনী বসু ও দুর্গামোহন দাসের কন্যা সরলা দাস। এদিকে ডাক্তার প্রসন্ন কুমার রায়ের সাথে সরলা দাসের বিয়ে হয়ে গেল, সরলা দাস হয়ে গেলেন সরলা রায়, তাঁর আর বসা হলো না বহুল কাঙ্ক্ষিত এন্ট্রান্স পরীক্ষায়। সময়টা সরলার পক্ষে গেল না আর অন্যদিকে কাদম্বিনী বসু হয়ে গেলেন একা। কিন্তু যিনি লড়াইয়ের ময়দানে অগ্রগামী, প্রধান সৈনিক, তিনি তো থেমে থাকতে পারেন না। সময়ের লড়াকুকন্যা কাদম্বিনী বসু একাই বহু লড়াইয়ে পাওয়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসলেন। যেন ভিনি, ভিডি, ভিসি (Veni, vidi, vici- I came, I saw, I conquered)– গেলেন, দেখলেন ও জয় করলেন। কাদম্বিনী বসু পরীক্ষায় পাস করে রেকর্ডের খাতায় নাম লেখালেন। মাত্র এক (১) নম্বরের জন্য প্রথম বিভাগ পাননি, তিনিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত এন্ট্রান্স পরীক্ষায় (১৮৭৯ খ্রি.) উত্তীর্ণ প্রথম বাঙালি নারী। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারির সংবাদ প্রভাকর লিখল : 'শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু বর্তমান বর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গীয় রমণীকুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, পাঠকগণ যথাকালে এ সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছেন।... আমরা জিজ্ঞাসা করি যে শ্রীমতী কাদম্বিনী এক্ষণে কোন বিদ্যালয়ে পড়িবেন? যুবকদিগের সহিত কোন কলেজে পাঠ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং অন্য বিদ্যালয়ই বা কোথায়?'

ঠিকই, কাদম্বিনী বসু তো এন্ট্রান্স পাস করলেন। তিনি এফ.এ. পরীক্ষায় বসতে চান। কিন্তু কলেজ কোথায়? ছেলেদের জন্য অনেক কলেজ আছে, মেয়েদের জন্য একটিও নেই। কো-এডুকেশনের কথা সে সময় কেউ কল্পনায় আনেননি। অবশেষে বেথুন স্কুলের এক অংশে ভারতের প্রথম মহিলা কলেজের যাত্রা শুরু হলো। নাম বেথুন কলেজ। সেই কলেজের ছাত্রী মাত্র একজন। নাম কাদম্বিনী বসু। স্কুল ভবনের একটি কক্ষে থাকা শুরু করলেন কাদম্বিনী বসু। ১৬ই জুন ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এফ.এ. বা ফার্স্ট আর্টস পড়া শুরু হলো। এই বেথুন কলেজই বাংলা তথা এশিয়ার প্রথম মহিলা কলেজ। কাদম্বিনী বসুর সাফল্যে বেথুন স্কুল-কলেজে রূপান্তরিত হওয়ায় চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। একজন ছাত্রী একজন অধ্যাপক মিলে একটি কলেজের যাত্রা, তা তো অভাবনীয় ও বিরল দৃষ্ট। *বামাবোধিনী* পত্রিকায় খবর হলো (ফাল্গুন ১২৮৬ বঙ্গাব্দ): '... কুমারী কাদম্বিনী ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বেথুন স্কুলে কলেজ শ্রেণী খুলিবার ব্যবস্থা করিয়া কটক কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক বাবু শশীভূষণ দত্ত, এম.এ কে এখানে আনয়ন করিয়াছেন...'। পরবর্তী সময়ে এই কলেজে যোগদান করলেন একজন শিক্ষিত ইউরোপীয়ান শিক্ষয়িত্রী এফ এ লিপ্‌স কোম। তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হলো সুপার বা তত্ত্বাবধায়কের। কাদম্বিনী বসু একাই তৈরি হলেন এফ.এ. পরীক্ষার জন্য। ১৮৮০ সালে বেথুন কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে কাদম্বিনী বসু এফ.এ. পাস করলেন, পেলেন তৃতীয় বিভাগ।

এদিকে আর একটি অনন্য নজির স্থাপন করলেন চন্দ্রমুখী বসু। তিনি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে এন্ট্রান্স পাস করে এফ.এ. পরীক্ষার আবেদন করলে আবেদন মঞ্জুর হয়। কিন্তু বেথুন স্কুল বা কলেজে অহিন্দুদের পড়ার সুযোগ ছিল না। শেষ পর্যন্ত খ্রিষ্ট ধর্মের অনুসারী চন্দ্রমুখী বসু অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে (দেরাদুনের Free Church Mission School) এফ.এ. পরীক্ষা দিলেন, উত্তীর্ণও হলেন, পেলেন দ্বিতীয় বিভাগ। অর্থাৎ এফ.এ. পাস প্রথম নারী যুগ্মভাবে কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু।

বেথুন স্কুল কলেজ সকল ঐতিহ্য ভেঙে অন্য ধর্মের মেয়েদের ভর্তির দুয়ার খুলে দিলো যার কৃতিত্ব কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসুর। তাঁরা রেখে গেলেন এক অনন্য নজির। এই দুই মহীয়সী বঙ্গরমণী আজও আলো ছড়িয়ে যান। কাদম্বিনী বসু একে একে যেন জয় করে চলেছেন হিমালয়ের তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় উঁচু চূড়া হয়ে আরও উপরে। এবার তিনি এভারেস্ট জয় করবেন। সময়ের চেয়ে এগিয়ে থেকে দুই কালজয়ী নারী এভারেস্ট জয়ের মতো সংগ্রামে নেমে পড়লেন। বেথুন কলেজেই দুইজন হলেন বি.এ. ক্লাসের ছাত্রী। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই বেথুন কলেজে বি.এ পড়া শুরু হয়। আর একটি রেকর্ড সৃষ্টির দ্বারপ্রান্তে তাঁরা পৌঁছে গেলেন অদম্য অধ্যবসায়ে। তখন পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে, এমনকি সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কোনো নারী গ্র্যাজুয়েট হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি। কাদম্বিনী বসুদের মেধা ও দৃঢ়তাকে ভর করে বেথুন স্কুল, বেথুন কলেজের চ্যালেঞ্জে এগিয়ে গেল। কলেজ বিভাগ পুরোপুরি চালু হলো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়ম করলেন, বি.এ. ক্লাসে গণিতের বদলে মেয়েরা পলিটিক্যাল ইকোনমি পড়তে পারবে। ধারণা ছিল, মেয়েরা অংক বুঝতে পারবে না। কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে কাদম্বিনী বসু গণিতকেই বেছে নিলেন। সময়টা ছিল প্রতিকূল, ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজ, অক্সফোর্ডের মতো নামি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ারও তখনও উন্মুক্ত হয়নি নারীদের জন্য। সে সময় অর্থাৎ ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু বি.এ. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেন এবং কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণও হলেন। সৃষ্টি হলো ইতিহাস, নারীশিক্ষার অনন্য নজির। দুই সাহসী কন্যা রেকর্ড গড়লেন, কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু হলেন শুধু ভারতবর্ষ নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম নারী গ্র্যাজুয়েট। ড. কৃষ্ণা রায় চমৎকার মূল্যায়ন করেছেন: 'যে বাঙালি কন্যা পিতৃগৃহের সব কিছু দোহন করে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়, কাদম্বিনী-চন্দ্রমুখীরা সে ধরনের কন্যা তো ছিলেন না। দৃপ্ত পা ফেলে তাঁরা নারীর জন্য অবরুদ্ধ উচ্চশিক্ষার দরজাটি খুলে ফেলেছেন। ... শিক্ষায় সমঅধিকারের প্রাপ্তিই পরবর্তী পর্বে কাদম্বিনীকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার দাবিতে মুখর করে তুলল।' (*কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়*, ২০২০, পৃ. ২৯)

কাদম্বিনী-চন্দ্রমুখীদের সাফল্য আসমুদ্র হিমাচলকে নাড়িয়ে দিলো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে এত লোক হয় যে, ভিড় সামলাতে পুলিশকে অনেক বেগ পেতে হয়। হল ভর্তি লোক, তারপরও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছাড়িয়ে রাস্তায় ট্রামলাইন পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য। উপাচার্য এইচ.জি. রেনল্ড স্বয়ং কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসুর হাতে বি.এ. ডিগ্রির সার্টিফিকেট অর্পণ করেন। বামাবোধিনী পত্রিকার ভাষ্য (এপ্রিল ১৮৮৩ খ্রি.): 'ভারতেতিহাসের সর্বপ্রথম মহানন্দকর এই ঘটনাটি স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হউক– গত ১০ মার্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান মহাসভায় কুমারী কাদম্বিনী বসু ও কুমারী চন্দ্রমুখী বসু বি.এ. উপাধি দ্বারা ভূষিত হইয়াছেন।' আর সমাজপতিরা যারা বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন নারীদের উচ্চশিক্ষার, তারা এবার পিছিয়ে গেলেন। একটি নমুনাই উদাহরণ হিসেবে যথেষ্ট। তৎকালীন বিশিষ্ট কবি হেমচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় খুবই ব্যঙ্গাত্মকভাবে 'বাঙালীর মেয়ে' শিরোনামে কাদম্বিনীদের কলেজে পড়া নিয়ে লিখেছিলেন:

ঐ যায় ঐ যায় বাঙালীর মেয়ে
খেয়ে যায়, নিয়ে যায় আর যায় চেয়ে।

অথচ এই দুই বঙ্গরমণী যখন হয়ে উঠলেন সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম স্নাতক, তখন এই কবিরই কলম ঘুরে গেল, এবারে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন ৫ স্তবকের দীর্ঘ কবিতা। শিরোনাম ছিল 'বিশ্ববিদ্যালয়ে (বঙ্গরমণীর উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে)'। বসুমতি পত্রিকায় তা মুদ্রিত হয়। কবিতাটির একটি স্তবক নিম্নরূপ:

হরিণ-নয়না শুন কাদম্বিনী বালা,
শুন ওগো চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা,
তোমাদের অগ্রপাঠী আমি একজন,
অই বেশ ও উপাধি করেছি ধারণ।

কাদম্বিনী বসুর চলার পথ থেমে যায়নি। ২৩শে জুন ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। এই তারিখটা শুধু একটি তারিখ নয়, সময়ের বাঁকবদলের দিন। কেমন ছিল সেই সময়? সেই সময়ের নারীদের প্রতি সমাজের প্রত্যাশা ১৩০১ বঙ্গাব্দের 'সৎসঙ্গ'-এর নির্দেশনায় পাওয়া যায়: 'স্ত্রী শুদ্ধ হইয়া প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বামীকে প্রণাম করিবেন, পরে গোময় বা জল দ্বারা প্রাঙ্গণে মণ্ডল দিবেন। এই গৃহকার্য শেষ করিয়া গৃহদেবতার পূজা করিবেন। তদনন্তর সমুদয় গৃহকার্য (রন্ধনাদি) শেষ করিয়া পতিকে ভোজন করাইবেন, পরে অতিথির সেবা করিয়া চারিটি আহার করিবেন।' এই হলো তৎকালীন সমাজচিত্র। অন্যদিকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে মেয়েদের ভর্তির কোনো নিয়ম নেই।

কাদম্বিনী বসু এফ.এ. পাস করেই কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তির আবেদন করেছিলেন। মহাপ্রতাপশালী কর্তৃপক্ষ তাঁর সে আবেদন পত্রপাঠ নাকোচ করে দেন। আবার স্নাতক হবার পর পুনরায় আবেদন করেন। ২৪শে জানুয়ারি ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ, ২৮শে জানুয়ারি ১৮৩৫ সালে স্থাপিত কলকাতা মেডিকেল কলেজে তখন নিয়ম ছিল এফ.এ. বা এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েও মেডিকেলে পড়া যেত। আরও নিয়ম ছিল বি.এ. পাস করে পড়তে আসলে মেডিকেল কলেজে পড়াশুনার কোনো খরচ লাগবে না। কিন্তু মেয়েদের ডাক্তারি পড়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল পুরোপুরি। তাই কাদম্বিনী বসুকে পাহাড় সমান বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এ লড়াইয়ে তাঁর পার্শ্বে সাহসী যোদ্ধা হিসেবে দাঁড়ালেন স্বামী দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

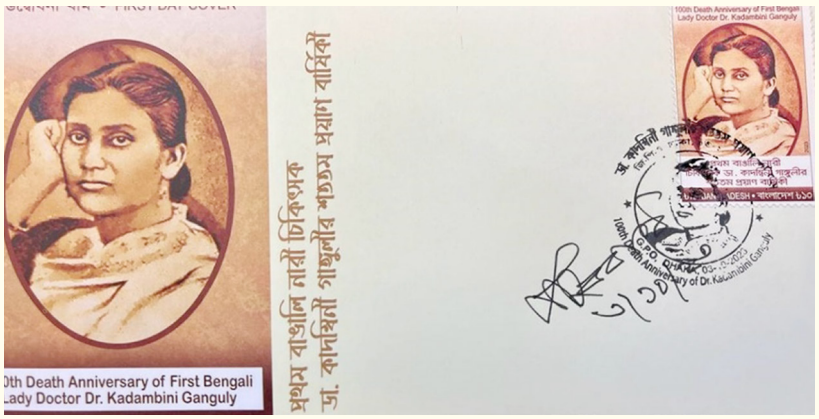

এই দুরন্ত সময়ে কাদম্বিনী বসুকে লড়াইয়ে নামতে হলো শুধু কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তির অনুমতি পেতে। এবার কাদম্বিনী বসুর আবেদন নাকোচ হলে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীসহ প্রগতিশীল ব্রাহ্মনেতারা আন্দোলন শুরু করলেন। কলেজ কাউন্সিল থেকে শিক্ষকদের প্রবল আপত্তি আসে। ডি.পি.আই. অফিস অবশেষে বাংলার ছোটোলাট স্যার রিভারস্ থমসনের হস্তক্ষেপ কামনা করে। তারই ধারাবাহিকতায় ২৯শে জুন ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে সরকার, মেডিকেল কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত নাকোচ করে কাদম্বিনী বসুকে মেডিকেল কলেজে ভর্তির অনুমতি দেয়। তৎকালীন *সঞ্জীবনী* পত্রিকা জানায় (১৫ই আষাঢ় ১২৯০ বঙ্গাব্দ): 'গবর্ণমেন্টের আদেশানুসারে মেডিকেল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় বি.এ. কে মেডিকেল কলেজ গ্রহণ করিয়াছেন।' এই সাড়া জাগানো ঘটনায় সমাজে আলোড়ন ওঠে। *বামাবোধিনী* পত্রিকা লিখল (আগস্ট ১৮৮৩ খ্রি.): 'শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (যিনি কুমারী কাদম্বিনী বসু বি.এ. বলিয়া পাঠিকাগণের নিকট পরিচিত) কলিকাতা মেডিকেল কলেজে সর্বপ্রথম ছাত্রীরূপে গৃহীত হইয়াছেন। আশ্চার্য্য। মেডিকাল কাউন্সিলের অধিকাংশ বিজ্ঞ ডাক্তার এ নূতন প্রথা প্রবর্তনের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের বিশেষ যত্নে স্ত্রীলোকদিগের ন্যায্য অধিকার স্থাপিত হইয়াছেন। এজন্য রিবর্স টমসনকে শতশত ধন্যবাদ।...'

ভর্তিযুদ্ধে জয়ী হয়ে কাদম্বিনী বসু কলকাতা মেডিকেল কলেজে প্রথম ছাত্রী হিসেবে ভর্তি হলেন। কিন্তু এক রণাঙ্গন থেকে আর এক রণাঙ্গনে যুদ্ধে নামতে হলো তাঁকে। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রধান ভরসা হয়ে থাকেন সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী। কিন্তু কাদম্বিনী বসুর দুর্ভাগ্য, অধিকাংশ শিক্ষক/অধ্যাপকগণ ছিলেন নারীশিক্ষা, বিশেষ করে মেডিকেলে নারীশিক্ষার ঘোরবিরোধী। গভর্নর থমসনের সিদ্ধান্তে কলেজ কাউন্সিল বাধ্য হলেন কাদম্বিনীকে ভর্তি করাতে। কিন্তু তাঁরা মন থেকে মেনে নেননি; কেবল অধ্যক্ষসহ কয়েকজন অধ্যাপক তাঁর পক্ষে ছিলেন, বাকিরা তাঁর বিরুদ্ধে। এই অবস্থায় প্রথম ও একমাত্র নারী হয়ে তাঁকে সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়েছে। সাথে ছিল সমাজের একশ্রেণির রক্ষণশীল মানুষ যারা কাদম্বিনী বসুর ডাক্তারি পড়ার জন্য বিরোধিতা করে গেছেন। তাছাড়া সহপাঠী ছাত্ররা সবাই তাঁর অনুকূলে ছিলেন না।

অবশেষে কলকাতা মেডিকেল কলেজে পাঁচ বছর কৃতিত্বের সাথে পড়াশুনা করে বিরুদ্ধবাদী ডা. রাজেন্দ্র চন্দ্রের মাধ্যমে এক নম্বরের জন্য ফেল করিয়ে দেওয়ায় কাদম্বিনী গাঙ্গুলী আর এম.বি. ডিগ্রি পাননি। তবে অর্জন করেন GMCB সার্টিফিকেট। তার মাধ্যমে

তিনি হন প্রথম বাঙালি নারী চিকিৎসক (১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ)। ডা. কাদম্বিনী গাঙ্গুলীকে তারপরও পদে পদে হাজারো বাধা ডিঙিয়ে এগিয়ে যেতে হয় কিন্তু তিনি কখনও হার মানেননি, আর্নেস্ট হেমিংওয়ের সেই উক্তি 'A man can be destroyed but not defeated'– তার উদাহরণ বহু আগেই তিনি প্রমাণ করে গেছেন। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের বাকি বিজয়গাথা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দ	পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু।
১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দ	বোম্বাইতে কংগ্রেসের ৫ম অধিবেশনে প্রথম ১০ জন নারী ডেলিগেটিদের একজন হয়ে যোগদান।
১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ	কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে সভাপতিকে প্রথম নারী হিসেবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।
১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ	ডাফরিন জেনানা হাসপাতালে চাকরি। বেতন ৩০০ টাকা।
১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দ	উচ্চশিক্ষার্থে বিলাতযাত্রা। একা একা জাহাজে ভ্রমণ। ২৩শে মার্চ ১৮৯৩ লন্ডনে পৌঁছান।
১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দ	পরীক্ষা শেষে ট্রিপল ডিপ্লোমা লাভ। এগুলো হলো LRCP (এডিনবরা), LRCS (গ্লাসগো), LFPS (ডাবলিন)।
১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দ	নভেম্বরে দেশে প্রত্যাবর্তন। ডা. কাদম্বিনী গাঙ্গুলীই প্রথম বাঙালি ও ভারতীয় নারী যিনি বিদেশ থেকে বিলিতি ডিগ্রি অর্জন করেন।
১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ	এত অর্জনের পরও হাসপাতালে যথাযথ পদায়ন হয়নি। ক্যাম্পরেল মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ। চিকিৎসা বিদ্যায় প্রথম ভারতীয় নারী অধ্যাপিকা। চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু।
১৮৯৫-১৮৯৬	খ্রিষ্টাব্দ নেপালের রাজদরবারে রাজমাতার চিকিৎসাভার গ্রহণ ও সুস্থ করে তোলা।
১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দ	গুরুতর যকৃত রোগে স্বামী দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর মৃত্যু।
১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দ	বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ।
১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ	বিহার ও উড়িষ্যায় কর্মরত নারী শ্রমিকদের দুরবস্থা দেখার জন্য সরকার নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিটির দায়িত্বপালন।
১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ	কলকাতা; ৩রা অক্টোবর ১৯২৩ মহীয়সী নারী, সাত সন্তানের জননী ডা. কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর জীবনাবসান। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

অন্তিম কথা, ডা. কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর তুলনা ডা. কাদম্বিনী গাঙ্গুলী। শিক্ষাজীবন বা কর্মজীবনের পদে পদে কেউ একগুচ্ছ রজনীগন্ধা দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানায়নি, বরং তাঁর বাষট্টি বছরের জীবনের বাঁকে বাঁকে বিছানো ছিল গুচ্ছ গুচ্ছ কাঁটা। কিন্তু তিনি সব কাঁটা দলিতমথিত করে সমাজের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে পৌঁছে গিয়েছেন চূড়ান্ত লক্ষ্যে। বিজয় অর্জন করে অক্ষয় স্বাক্ষর রেখে গেছেন এই মহীয়সী বাঙালি নারী। ডা. কাদম্বিনী গাঙ্গুলী নিঃসন্দেহে প্রথম বাঙালি নারী ডাক্তার। শুধু এই কৃতিত্ব শেষ কথা নয়। বাঙালির ক্রমসংকুচিত মন ও মননকে পাশে ঠেলে তিনি একে একে অসাধ্য সাধন করেছেন। দ্যুতিময় খ্যাতি আর অনিন্দ্য সুষমায় ভরা ব্যক্তিগত ও কর্মজীবনের এই ক্ষণজন্মা নারী কিন্তু তাঁর সময়ে পাননি যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা। কবিগুরু ও কাদম্বিনী একই বছরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কবিগুরুর কোনো লেখায় এই বিদূষী কন্যার কথা থাকলে অনেক কিছু জানা যেত। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বেথুন কলেজের সভাপতি ছিলেন ও নারী আন্দোলনেরও ছিলেন অগ্রদূত, কিন্তু তিনি তাঁর কোনো লেখায় বা বক্তৃতায় কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর প্রসঙ্গ আনেননি। অন্যদিকে মোহাচ্ছন্ন সমাজ কখনও তাঁকে স্বীকৃতি দেয়নি। পাশে পেয়েছেন শুধু সময়ের সাহসী যোদ্ধা তাঁর স্বামী, নারী আন্দোলনে অগ্রদূত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, আরও পেয়েছেন কাছে অগ্রগামী ব্রাহ্মসমাজকে। আর তাঁর গর্বিত পিতা ব্রজকিশোর বসুর অন্তহীন আশীর্বাদ পেয়েছেন। তিনিও নারীকল্যাণ কামনায় যে সমিতি গড়ে তুলেছিলেন ভাগলপুরে, তা ভারতবর্ষে তো বটে, পৃথিবীতে প্রথম। কিন্তু কাদম্বিনী বসুর স্নেহময়ী মা সম্পর্কে আলোচনা একদম নেই, নামটিও জানা যায়নি। অন্যান্য ভাইবোনদের কথাও রয়ে গেছে আলোচনার বাইরে। এমন খ্যাতিমান মহীয়সী রমণীর লেখা স্মৃতিকথা, এমনকি ডায়েরির একটি পাতা কোথাও মেলেনি। কিন্তু কাল হতে কালান্তরে ডা. কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বলেন স্বপ্ন ও সুন্দরের কথা, তাঁর জীবন ও কর্মের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় বহমান নদীর ঢেউ ভাঙা ঢেউয়ের বর্ণিল শব্দমালা, শ্রাবণ জ্যোৎস্নার মাদকতা, রজনীগন্ধার মিষ্টিমধুর পেলবতা।

কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ছিলেন দুরন্ত সময়কে অতিক্রমকারী এক ব্যতিক্রমধর্মী নারী। নিজের সোনালি সময়কে রাঙিয়েছেন স্বীয় কর্মগুণে। সমাজের শিরা-উপশিরায় বিদ্যুতের ছোঁয়ায় সরিয়ে দিতে চেয়েছেন সকল আঁধার। তৈরি করতে চেয়েছেন স্বপ্নে বিভোর একটি প্রজন্ম। তিনি যেমন ইতিহাসের পাতায় বহু কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তেমনি ইতিহাস তাঁর নাম লিখে রেখেছে সোনার হরফে। এখানেই ডা. কাদম্বিনী গাঙ্গুলী কালজয়ী।

সেই ইতিহাসের পাতায় আর একটি অনন্য সংযোজন ডা. কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর মৃত্যুশতবার্ষিকী (১৯২৩-২০২৩) উপলক্ষে বাংলাদেশ ডাকবিভাগ দশ টাকা মূল্যমানের একটি আকর্ষণীয় স্মারক ডাকটিকিট, দশ টাকা মূল্যমানের একটি উদ্বোধনী খাম ও পাঁচ টাকা মূল্যমানের একটি ডাটাকার্ড এবং একটি বিশেষ সিলমোহর প্রকাশ করেছে (৩-১০-২০২৩)।

তথ্যের উৎস: প্রথম বাঙালি নারী চিকিৎসক ডা. কাদম্বিনী গাঙ্গুলী: (২০২৩) (২য় সংস্করণ), ড. মোহাম্মদ আলী খান, নয়নজুলি, ঢাকা।

ড. মোহাম্মদ আলী খান: লেখক, গবেষক ও কবি/অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, khanma1234@gmail.com

মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতার গুরুত্ব

চয়নিকা সুলতানা

'মানসিক স্বাস্থ্য সর্বজনীন মানবাধিকার'– প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছরের মতো এ বছরও ১০ই অক্টোবর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও নানা আয়োজনে পালিত হয় দিবসটি। বিশ্বব্যাপী মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে ১৯৯২ সাল থেকে প্রতিবছর 'বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস' পালন করা হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য মানবতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যা আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ করার এবং সমাজে পরিপূর্ণভাবে অবদান রাখার সুযোগ করে দেয়। সারা বিশ্বে প্রতি আট জনের মধ্যে একজন মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা নিয়ে বেঁচে আছেন। মানসিক সমস্যাকে এই সমাজের অনেকেই 'সমস্যা' বা 'রোগ' মনে করে না। নিভৃতে বাড়তে থাকা মানসিক সমস্যার নেতিবাচক প্রভাব ব্যক্তিজীবনেও পড়ে। আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে অসংলগ্ন আচরণ কিংবা আত্মহত্যার প্রবণতাও দেখা যায়। পরিবারের সদস্যরা অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যাটা অনুভব করতে পারেন। কিন্তু সমাধানের জন্য কী করতে হবে, কোথায় যেতে হবে, এসব নিয়ে দ্বিধায় থাকেন তারা।

করোনাকালে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরকার অসমতা ও সীমাবদ্ধতা উন্মোচিত হয়, ফলে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সক্ষমতা পুনর্বিবেচনা করা খুব জরুরি হয়ে পড়ে। এটি সামাজিক-আবেগগত শিক্ষার (এসইএল) তাৎপর্য ও মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্বের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে এবং আমাদের শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে উৎসাহিত করে। মহামারিকালে শিক্ষার্থীদের দূরশিক্ষণের অভিজ্ঞতা-সম্পর্কিত একটি গবেষণায় শিশুদের সুস্বাস্থ্যের ওপর স্কুল বন্ধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে রুটিন না থাকার কারণে হতাশা, শারীরিক ও সামাজিক কার্যক্রম কমে যাওয়া এবং বন্ধুবান্ধব ও শিক্ষকদের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ কমে আসা। এতে আরও দেখা যায়, স্কুল বন্ধ ও খোলার পর শিশুদের মধ্যে উদ্বেগ ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার লক্ষণগুলো প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে, বিশেষত নিম্ন আয়ের পরিবার থেকে আসা শিশুদের মধ্যে।

মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচলিত পদ্ধতিতে দেখা যায়, সাধারণত সমস্যা শুরু হওয়ার পর সহায়তার খোঁজ করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়গুলো শারীরিক সমস্যার মতো গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় না। আবার অনেকেই মানসিক রোগ বা সমস্যাগুলোকে মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে এক করে দেখেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করে জানায়, মানসিক স্বাস্থ্য মানসিক রোগ না থাকার চেয়েও বেশি কিছু। এটি অত্যন্ত জটিল ধারাবাহিক একটি প্রক্রিয়া, যেখানে এক ব্যক্তি

থেকে আরেক ব্যক্তিতে আলাদা রকম অভিজ্ঞতা হয়, নানা রকম অসুবিধা ও মানসিক চাপের ওপর এটি নির্ভর করে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই এর সামাজিক ও ক্লিনিক্যাল ফলাফলও ভিন্ন হয়।

ডব্লিউএইচও'র মতে, মানসিক সুস্থতার একটি পর্যায় হলো মানসিক স্বাস্থ্য, যা জীবনের চাপ নেওয়া, সক্ষমতা সম্পর্কে বুঝতে পারা, ভালোভাবে শেখা ও কাজ করা, এমনকি সমাজে অবদান রাখার ক্ষেত্রেও মানুষকে সক্ষম করে তোলে। তাই মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের যথার্থ বোঝাপড়া অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে আমাদের আনন্দ, আবেগগত সুস্থতা, আত্ম-সহানুভূতি বা এ রকম ছোটো ছোটো বিষয়ে যোগাযোগের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। তাই আমাদের শিশুদের জন্য সামাজিক-আবেগগত শিক্ষা (এসইএল) নিশ্চিত করার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে, যেখানে স্কুল-পরিসীমার ভেতর ও বাইরের দুই জায়গাতেই শিশুদের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তৃত দক্ষতা ও গুণাবলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

শিশুদের সাক্ষরতা ও গাণিতিক শিক্ষার পাশাপাশি তাদের মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শৈশব থেকেই স্থিতিশীল ও আবেগীয় বুদ্ধিবৃত্তি তৈরি করতে স্কুলগুলোর উচিত মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলো স্বীকৃতি দেওয়ার একটি সামগ্রিক কৌশল গ্রহণ করা। আর তা অর্জন করার ক্ষেত্রে শিশুদের এসইএল ও জীবন সম্পর্কিত সমস্যাগুলোয় কাজে লাগবে এমন দক্ষতায় পারদর্শী হতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সামগ্রিক সুস্বাস্থ্যের ওপর গুরুত্বসংবলিত একটি সুষ্ঠু কারিকুলাম।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি)-৩ নম্বর লক্ষ্যে স্বাস্থ্যকর জীবন ও সুস্বাস্থ্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে বিশেষভাবে আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুহারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যেখানে ২০৩০ সালের মধ্যে এই হার এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আত্মহত্যা প্রতিরোধের মতো মানসিক স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিষয়গুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে নিরলস মনোযোগ, পর্যাপ্ত তহবিল ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে তাঁর বাণীতে বলেন, মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নারী ও তরুণরা। মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত চারজনের মধ্যে তিনজনই পর্যাপ্ত চিকিৎসা পান না অথবা কোনোও সেবাই পান না। আবার অনেকে অসম্মান ও বৈষম্যের সম্মুখীন হন। মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষ অধিকার নয়, বরং মৌলিক মানবাধিকার এবং অবশ্যই সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার আওতার অংশ হতে হবে। সব সরকারকে অবশ্যই এমন সেবা প্রদান করতে হবে যা মানুষের সুস্থ হয়ে ওঠায় সহায়ক হয় এবং তাদের অধিকার সমুন্নত রাখে। এর মধ্যে রয়েছে কমিউনিটিভিত্তিক সহায়তা জোরদার করা এবং বৃহত্তর স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবায় মনস্তাত্ত্বিক সহায়তাকে অন্তর্ভুক্ত করা। তিনি আরও বলেন, একইসঙ্গে আমাদের অবশ্যই নিগ্রহ মোকাবিলা করতে হবে এবং সেই সব বাধা ভেঙে ফেলতে হবে যা লোকজনকে সহায়তা চাইতে বাধা দেয়। আমাদের অবশ্যই মানসিক সমস্যার মূল কারণ, যেমন- দারিদ্র্য, অসমতা, সহিংসতা, বৈষম্য মোকাবিলা করতে হবে। আরও সহানুভূতিশীল ও স্থিতিস্থাপক সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত একটি সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা সুস্থ ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষাকে একটি প্যারাডাইমের দিকে নিয়ে যেতে হবে। সুস্বাস্থ্যের উপায় হিসেবে মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা শুধু উন্নয়ন দক্ষতার জন্যই জরুরি নয়, বরং একটি উন্নত জীবনের জন্যও প্রয়োজনীয়। বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসে আসুন আমরা অঙ্গীকার করি, মানসিক স্বাস্থ্যকে একটি সর্বজনীন মানবাধিকার হিসেবে নিশ্চিত করি ও সমুন্নত রাখি। আমরা এক সঙ্গে একটি স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ে তুলি যেখানে প্রত্যেকে সমৃদ্ধি লাভ করতে পারবে।

চয়নিকা সুলতানা: প্রাবন্ধিক

ডিজিটাল কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের সদস্য হলো বাংলাদেশ

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে ২০শে সেপ্টেম্বর ডিজিটাল কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (ডিসিও)-এর আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্যপদ গ্রহণ করল বাংলাদেশ। এ বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষে ডিসিও সদস্য রাষ্ট্র হওয়ার সনদে স্বাক্ষর করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনে প্রায় ১৫টি দেশের আটশো মিলিয়ন জনগোষ্ঠীর বিশাল একটা মার্কেট রয়েছে। বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ডিসিও'র সদস্য হলো। তিনি বলেন, ডিসিও'র সদস্য হতে পেরে আমাদের চারটি সুযোগ তৈরি হলো। প্রথমটি, বাংলাদেশের ডিজিটাল এন্টারপ্রেনিয়র স্টার্টআপদের ব্যাবসা করার সুযোগ হবে। দ্বিতীয়টি, বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার সুযোগ তৈরি হবে। তৃতীয়টি, ১৫টি দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সাইবার সিকিউরিটিতে আরও বেশি শক্তিশালী জায়গায় যেতে পারবে। চতুর্থটি, স্টার্টআপ পাসপোর্ট নিয়ে কাজ হচ্ছে। অর্থাৎ একটি দেশের স্টার্টআপরা ১৫টি দেশে কাজ করতে পারবে। এ চারটি এরিয়াতেই মূলত ডিসিও সেক্রেটারি জেনারেলের সাথে ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্যপদ গ্রহণ করেছি এবং সেই সনদে স্বাক্ষর করেছি। ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের জায়গায় বাংলাদেশ এখন অত্যন্ত আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে বলেও তিনি জানান।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বের কাছে একটি অনুকরণীয় সফল দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডিসিও মেম্বারশিপের ফলে আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' রূপকল্পটি পেয়েছি, সেখানে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট সোসাইটি গড়ে তোলা হবে। ২০৪১ সালের সেই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এই ডিসিও'র মেম্বার হওয়ার ফলে আমরা আমাদের লক্ষ্যটা অর্জনে আরও বেশি এগিয়ে যেতে পারব।

প্রতিবেদন: সামিরা আলম

স্বপ্ন বোনার কারিগর শিক্ষক

সেলিনা আক্তার

শিক্ষা হলো জাতির মেরুদণ্ড। একটি জাতির উন্নয়নের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। আর শিক্ষার মূল চাবিকাঠি হলো শিক্ষক। শিক্ষক হলেন সেই মানুষ যিনি ছাত্রছাত্রীদের মনে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দেন। তিনিই ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। শিক্ষকরা সংকটে নেতৃত্ব দেন, ভবিষ্যৎ পুনঃনির্মাণ করেন। শিক্ষকরা হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর। একজন আদর্শ মানুষ গড়তে আদর্শ শিক্ষকের কোনো বিকল্প নেই। আর শিক্ষকেরা মোমবাতির মতো নিজে পুড়ে অন্যকে শিক্ষার আলো দান করেন। শিক্ষা মানুষের দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করে। তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ, সবাক, সকর্ম করে তুলে মানুষের মধ্যে ঘুমন্ত মানবতাকে জাগ্রত করে। আর পেশাগত দায়িত্ববোধ, মেধা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দক্ষতায় পরিপূর্ণ শিক্ষক হচ্ছেন দেশ ও জাতির অনন্য সম্পদ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন দক্ষ নাগরিক হিসেবে নিজেকে তৈরি করার সব ধরনের মন্ত্র শিখিয়ে দেন একজন শিক্ষক।

শিক্ষা চেতনাকে শানিত করে, বুদ্ধিকে প্রখর করে, বিবেককে জাগ্রত করে। শিক্ষা আত্মিক মুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটায়। শিক্ষা মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টির দুয়ার খুলে দেয়। এ দুয়ার আমাদের জ্ঞানের পথ দেখায়। আমরা জানি, 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' তাই মুক্তির বিশাল ভুবনে নিজেকে আবিষ্কার করতে হলে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণের বিকল্প নেই। শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়েই সেই জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণ সম্ভব।

শিক্ষা ছাড়া জাতির উন্নতি যে সম্ভব নয়, তা অনুধাবন করেছিলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেটা তাঁর শিক্ষাদর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে শিক্ষকদের উদ্দেশে এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আগামী প্রজন্মের ভাগ্য শিক্ষকদের ওপর নির্ভর করছে। শিশুদের যথাযথ শিক্ষার ব্যত্যয় ঘটলে কষ্টার্জিত স্বাধীনতা অর্থহীন হবে'। তাই লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত সদ্য স্বাধীন দেশকে তার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' হিসেবে বিনির্মাণের লক্ষ্যে তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ১৯৭২ সালে সংবিধানে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গীকার সন্নিবেশ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন শিক্ষককের চাকরি সরকারিকরণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির সোপান রচনা করেন। তারই ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২৬ হাজার ১৯৩টি রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণসহ প্রধান শিক্ষকের পদকে দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদা প্রদান এবং সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল এক ধাপ উন্নীতকরণসহ ১ লাখ ৫ হাজার ৬১৬ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এটি সর্বজন স্বীকৃত আরেকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতিবছর ৫ই অক্টোবর বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস'। এই দিবসটি শিক্ষকদের অবদানকে স্মরণ করার জন্য পালন করা হয়। ইউনেস্কোর মতে, বিশ্ব শিক্ষক দিবস শিক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পালন করা হয়। বিশ্বের ১০০টি দেশে এই দিবসটি পালিত হয়ে থাকে। শিক্ষাকে যদি জাতির মেরুদণ্ড ধরা হয়, তবে সেক্ষেত্রে শিক্ষকরা হলেন শিক্ষার মেরুদণ্ড। কিন্তু শিক্ষকদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে দেখা যায়। শিক্ষা খাত সময়ের সেরা বিনিয়োগের ক্ষেত্র। সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট বা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের জন্য শিক্ষায় বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই। ভারতের নোবেল বিজয়ী শিক্ষাবিদ কৈলাশ সত্যার্থী বলছেন, শিক্ষায় ১ ডলার বিনিয়োগ করলে আগামী ২০ বছরের মধ্যে ১৫ গুণ রিটার্ন পাওয়া সম্ভব। ফলে শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়িয়ে শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীদের আগ্রহ বাড়াতে হবে। আগ্রহী শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছ ও যুগোপযোগী মূল্যায়নের মাধ্যমে এই পেশায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা শিক্ষার উন্নয়নে এখন বড়ো চ্যালেঞ্জ। তথ্যপ্রযুক্তির বদৌলতে পৃথিবী প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে শিক্ষকদেরও বদলাতে হবে প্রতিনিয়ত। একজন শিক্ষক আজকেই আগামী দশকের সুযোগ ও সমস্যা মোকাবিলার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করছেন। ফলে শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী ও বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ, সিম্পোজিয়াম ও

কর্মশালার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকদের আত্মোন্নয়নের জন্য প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষকদের গড়ে তুলতে হবে আন্তর্জাতিক মানের।

বর্তমান সরকার শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কল্যাণে অতিসম্প্রতি শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট বিল জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। শিক্ষকদের হয়রানি, দুশ্চিন্তা ও ঝামেলা থেকে পরিত্রাণ দিতে অনলাইনে শিক্ষক বদলি চালু হয়েছে। পরিমার্জিত পাঠ্যক্রমের সাথে শিক্ষকদের খাপ খাইয়ে নিতে প্রশিক্ষণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। শিক্ষক ঘাটতি দূর করতে চলতি বছরের শুরুতে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে ৩৭ হাজার ৫শত ৭৪ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে; যা স্বাধীনতার পর সর্বোচ্চ। আরও নতুন শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষকদের ম্যাথ অলিম্পিয়াডের মাস্টার ট্রেইনারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে ইংরেজি বিষয়ে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে গড়ে তোলার কাজ চলমান আছে। প্রতিটি বিষয়ের মাস্টার ট্রেইনারদের দ্বারা পর্যায়ক্রমে প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার এবং প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের এ সময়ে শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহজ, সুন্দর ও কার্যকরভাবে পাঠদান করতে শিক্ষকদের দ্বারাই বিভিন্ন বিষয়ে কন্টেন্ট ডেভেলপ করা হয়। প্রযুক্তির সাবলীল ব্যবহারে অভ্যস্ত হতে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া সরবরাহ করা হয়েছে। ইন্টারনেট সংযোগ ও ওয়াইফাই সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হচ্ছে। যাতে শিক্ষকগণ এসব ল্যাব ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে শিক্ষা প্রদান করতে পারেন।

অতিসম্প্রতি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) আইন ২০২৩ অনুমোদিত হয়েছে। এ আইন পাসের ফলে একটি আধুনিক, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসেবে নেপের বিকশিত হবার দুয়ার উন্মুক্ত হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও কারিকুলাম উন্নয়নেও এ প্রতিষ্ঠান কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনা, গবেষণা জার্নাল প্রকাশের পাশাপাশি নেপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন করতে পারবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার পুরোনো ধারার শিক্ষার খোলনলচে পাল্টে এমন এক নতুন শিক্ষার বীজবপনের কাজে হাত দিয়েছে, যা শিক্ষার্থীর মস্তিষ্ক ও পিঠ থেকে মুখস্থবিদ্যার বোঝা ঝেড়ে ফেলে তাদের কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান, গবেষণা ও ভাবনার শক্তিকে জাগাবে ও নেতৃত্বের গুণাবলি তৈরিতে উপযোগী করে তুলবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্মিলনে শ্রেণিকক্ষেই প্রতিটি জিজ্ঞাসা ও জানার মাধ্যমে শিশুর ভাব-ভাবনার উত্তরণে সরকার গুরুত্বারোপ করেছে। এর ফলে বয়সোচিত যোগ্যতা এবং সরাসরি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশু তার জানার পরিধি বাড়াবে, আপন ভুবন সাজাবে। সে নিজেই নানা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে, তা মোকাবিলা করে অভীষ্ট গন্তব্য পৌঁছাবে।

শিক্ষকদের অবদান অপরিসীম। শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের মনে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দেন। তারাই ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদেরকে একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। শিক্ষকদের অবদানের ফলে একটি জাতি উন্নত হয়। শিক্ষকরা একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণ করেন। তাই শিক্ষকদের অবদানকে স্মরণ করা এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

সেলিনা আক্তার: সহকারী তথ্য অফিসার, পিআইডি

ইতালির Guglielmo Marcony গ্রন্থাগারে 'বাংলাদেশ কর্নার' উদ্বোধন

বাংলাদেশ দূতাবাস এবং রোমে অবস্থিত গুলিয়েলমো মার্কনি (Guglielmo Marcony) গ্রন্থাগারের যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থাগারে ২৮শে সেপ্টেম্বর 'বাংলাদেশ কর্নার'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। বিদেশি অতিথি ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যাপক উপস্থিতির মধ্যে 'বাংলাদেশ কর্নার' যৌথভাবে উদ্বোধন করেন ইতালিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. শামীম আহসান এবং মার্কনি গ্রন্থাগারের পরিচালক কিয়ারা পমা।

উদ্বোধনী বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত মো. শামীম আহসান বিপুল বাংলাদেশিদের কর্মস্থল রোমের একটি স্বনামধন্য গ্রন্থাগার গুলিয়েলমো মার্কনিতে 'বাংলাদেশ কর্নার' স্থাপনের গুরুত্ব তুলে ধরে লাইব্রেরির পরিচালককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে উপহার হিসেবে প্রদত্ত ৭০টি বইয়ের মধ্যে রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনী (বাংলা ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত), বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর বিভিন্ন প্রকাশনা, মহান মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বাংলা ভাষায় বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম, রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা বিষয়ক প্রকাশনা এবং ইতালীয় ভাষায় রচিত এবং অনূদিত বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার ওপর প্রকাশনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়ন অভিযাত্রা বিষয়ক কয়েকটি প্রকাশনাও স্থান পায় গ্যালারিতে। রাষ্ট্রদূত ভাষা শহিদের আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করে উপস্থিত বাংলাদেশ কমিউনিটির সবাইকে বই পড়া, বাংলা ভাষা চর্চা এবং জ্ঞানার্জন করতে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা, প্রবাসী সাংবাদিক, বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ, ইতালিয়ান পাঠক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: ইশরাত হোসেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে অক্টোবর ২০২৩ ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশনে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন– পিআইডি

দুর্গাপূজা

সুষমা ফাল্গুনী

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের নাম দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব। বাঙালি হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মহা ধুমধামের সাথে এ উৎসব পালন করে থাকে। দেবী দুর্গা হলেন শক্তির রূপ। দুর্গা মহামায়া, শিবানী, ভবানী, দশভুজা, সিংহবাহনা ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। দুর্গ বা দুর্গম নামক দৈত্যকে বধ করেন বলে তাঁর নাম হয় দুর্গা। জীবের দুর্গতি নাশ করেন বলেও তাঁকে দুর্গা বলা হয়। এ পূজা সর্বজনীন। দেবী দুর্গা আমাদের মাঝে মাতৃ রূপে বিরাজ করেন। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শরৎকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা এবং এ পূজা উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব হচ্ছে শারদীয় দুর্গোৎসব। পক্ষান্তরে বসন্তকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা বাসন্তী পূজা নামে অভিহিত। বাসন্তী পূজা এখনও প্রচলিত থাকলেও শারদীয় দুর্গাপূজা আবহমানকাল থেকে মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তবে অনেক সময় পঞ্জিকা অনুযায়ী কার্তিক মাসেও দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

পুরাণে দেখা যায়, একদা মহিষাসুরের ভক্তি ও তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। মহিষাসুর এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অমরত্বের বর প্রার্থনা করেন। কিন্তু ব্রহ্মা সরাসরি অমরত্বে বর না দিয়ে বর দিলেন– কোনো পুরুষের হাতে তার মৃত্যু হবে না। অতঃপর মহিষাসুর অসুরকুলের রাজা হন এবং তার মনে বাসনা জাগে স্বর্গ-মর্ত্য জয় করার। অবধ্য মহিষাসুর দেবতাদের বিতারিত করে স্বর্গরাজ্য দখল করেন। নিরুপায় দেবতারা রাজ্যহারা হয়ে ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণুর নির্দেশে সকল দেবতার তেজঃপুঞ্জ একত্রিত হয়ে দশভুজা এক নারী মূর্তির আবির্ভাব ঘটে, তিনিই হলেন দেবী দুর্গা। তারপর দেবী দুর্গাকে সুসজ্জিত করে দেওয়া হয় ১০টি মারণাস্ত্র দিয়ে। দেবতা শিব দিলেন ত্রিশুল, বিষ্ণু দিলেন চক্র, ইন্দ্রসহ অন্যান্য দেবতারা দিলেন তীর-ধনুক, তরবারি, ঢাল, বিষধর সর্প, তীক্ষ্ণ কাঁটাওয়ালা শঙ্খ, বিদ্যুৎবাহী বজ্রশক্তি এবং একটি পদ্মফুল। এভাবে সুসজ্জিতা দেবী ১০ দিনব্যাপী যুদ্ধে মহিষাসুরকে বধ করেন। তাই দেবীর আরেক নাম মহিষাসুরমর্দিনী। মহিষাসুর বধের পরে দেবতারা স্বর্গরাজ্য ফিরে পেলেন এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে শান্তি ফিরে এলো।

দুর্গাপূজার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। হিন্দু পুরাণে দুর্গাপূজার সূচনা সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনি পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দেবী মাহাত্ম্যম গ্রন্থে বর্ণিত দুর্গা ও দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে দেবী দুর্গার কাহিনিগুলো সর্বাধিক জনপ্রিয়। শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ দুর্গাপূজার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। শ্রীশ্রীচণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের একটি নির্বাচিত অংশ। এতে তেরোটি অধ্যায়ে মোট সাতশটি শ্লোক আছে। দুর্গাপূজার প্রচলন সম্পর্কে পুরাণে লিখিত হয়েছে যে, পুরাকালে রাজ্যহারা হয়ে রাজা সুরথ এবং স্বজন প্রতারিত সমাধি বৈশ্য একদিন মেধস মুনির আশ্রমে যান। সেখানে মুনির পরামর্শে তারা দেবী দুর্গার পূজা করেন। পূজায় তুষ্টা দেবীর বরে তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এ পূজা বসন্তকালে হয়েছিল বলে এর নাম 'বাসন্তী পূজা'।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে জানা যায় যে, রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য এবং সীতা উদ্ধারের জন্য অকালে অর্থাৎ শরৎকালে দেবীর পূজা করেছিলেন। তখন থেকে এর নাম হয় অকালবোধন বা শারদীয় দুর্গাপূজা। সচরাচর দেবী দুর্গার যে মূর্তিটি দেখা যায় সেটি পরিবার সমন্বিতা। এই মূর্তির মধ্যস্থলে দেবী দুর্গা সিংহবাহিনী ও মহিষাসুরমর্দিনী; তাঁর মুকুটের উপরে শিবের ছোটো মুখ; দেবীর

ডান পাশে উপরে দেবী লক্ষ্মী ও নীচে গণেশ; বাম পাশে উপরে দেবী সরস্বতী ও নীচে কার্তিক। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর সংলগ্ন অঞ্চলে দেবী দুর্গার এক বিশেষ মূর্তি দেখা যায়। সেখানে দেবীর ডান পাশে উপরে গণেশ ও নীচে লক্ষ্মী, বামে উপরে কার্তিক ও নীচে সরস্বতী এবং কাঠামোর উপরে নন্দী-ভৃঙ্গীসহ বৃষভ বাহন শিব ও দুপাশে দেবীর দুই সখী জয়া ও বিজয়া অবস্থান করেন। কোথাও কোথাও দুর্গোৎসবে লক্ষ্মী ও গণেশকে সরস্বতী ও কার্তিকের সঙ্গে স্থান বিনিময় করতে দেখা যায়। আবার কোথাও দুর্গাকে শিবের কোলে বসে থাকতেও দেখা যায়। এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে দেবী দুর্গার বিভিন্ন রকমের স্বতন্ত্র মূর্তিও চোখে পড়ে। তবে দুর্গার কাঠামোগত বিন্যাসে যতই বৈচিত্র্য থাকুক দুর্গোৎসবে প্রায় সর্বত্রই দেবী দুর্গা সপরিবার পূজিত হন।

দুর্গাপূজা মূলত ১০ দিনের উৎসব। শুরু হয় দেবীপক্ষে। শুরুর পর্বের নাম মহালয়া। মহালয়াতে দেবী দুর্গাকে পিতৃলয়ে আহ্বান জানানো হয়। মহালয়ার পরে আসে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী। এ ১০ দিনের মধ্যে মহালয়া এবং মহাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী, মহানবমী ও দশমী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূজার এই কয়েকদিন সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গণ দেবী দুর্গার প্রণাম মন্ত্রে মুখরিত হয়ে ওঠে। 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা/ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ/ যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা/ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।' ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত একেক দিনে একেক রীতিতে দেবীর বন্দনা করা হয়। ষষ্ঠী পূজার দিনে দুর্গাপূজার এক মহাপর্ব। সন্ধ্যায় বিল্ববৃক্ষে বোধন আমন্ত্রণ অধিবাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং ঐ সময় দেবীর মৃন্ময় প্রতিমায় অধিবাস করা হয়। পরদিন মহাসপ্তমী ভোরবেলায় বিল্ববৃক্ষ মূলে পূজাদি পর্ব করে নবপত্রিকা স্নান করানো হয়। নবপত্রিকাকে চলিত ভাষায় কলাবৌ বলে। নবপত্রিকা স্নান করিয়ে গণেশের পাশে স্থাপন করে যথাবিধি অনুযায়ী মহাসপ্তমী পূজা শেষ হয়। মহাঅষ্টমীর দিনে 'কুমারী পূজা' করা হয়। 'কুমারী পূজা' হলো তন্ত্রশাস্ত্র মতে অনধিক ষোলো বছরের অরজঃস্বলা কুমারী মেয়ের পূজা। এ মহাঅষ্টমীতে সন্ধিপূজাও করা হয়। এ পূজার সময়কাল ৪৮ মিনিট। অষ্টমী তিথির শেষ ২৪ মিনিট ও নবমী তিথির প্রথম ২৪ মিনিট মোট ৪৮ মিনিটের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এই পূজা। যেহেতু অষ্টমী ও নবমী তিথির সংযোগ স্থলে এই পূজা হয় তাই এই পূজার নাম সন্ধিপূজা। অর্থাৎ সন্ধিকালীন পূজা। সন্ধিপূজার সমাপ্তি পর্ব থেকেই মহানবমী শুরু হয়; দেবীকে 'অন্নভোগ' সাজিয়ে দেওয়া হয়। ভক্তদের জন্য এ প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা থাকে। দেবী দুর্গার বিসর্জনের মধ্য দিয়ে বিজয়া দশমী শুরু হয়। আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে এই উৎসব সমাপ্ত হয়।

এ দিনে বাঙালি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার প্রতিফলন ঘটে। যেমন– শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ধান- দূর্বা সমর্পণ, একে অপরের মিষ্টিমুখ করানো, দেবীর সিঁথিতে সিঁদুর পরানো এবং সর্বশেষ উলুধ্বনির মাধ্যমে দেবী দুর্গার কাছে পরিবার-পরিজনসহ বিশ্বের সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করা হয়। এই সিঁদুর খেলার মধ্য দিয়েই বিজয়া দশমীর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

এ উপলক্ষে নতুন পোশাক পরে চলে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে প্রতিমা দর্শন। সকলে কোলাকুলি, প্রণাম, আশীর্বাদ ইত্যাদির মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। আত্মীয়স্বজন সকলে একত্র মিলিত হয়। আর জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণে দুর্গোৎসব হয়ে ওঠে সর্বজনীন। কেউ ব্যক্তিগতভাবে করে, কেউবা সমষ্টিগতভাবে। সমষ্টিগত পূজাকে বলা হয় বারোয়ারি বা সর্বজনীন দুর্গোৎসব। ঢাকেশ্বরী মন্দিরসহ সারা বাংলাদেশে হাজার হাজার মন্দিরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

সুষমা ফাল্গুনী: কবি, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক

'ই-কোয়ালিটি সেন্টার ফর ইনক্লুসিভ ইনোভেশন'-এর উদ্বোধন

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন একটি সাইড ইভেন্টে 'ই-কোয়ালিটি সেন্টার ফর ইনক্লুসিভ ইনোভেশন' উদ্বোধন করেন। 'ই-কোয়ালিটি সেন্টার ফর ইনক্লুসিভ ইনোভেশন'-এর মাধ্যমে 'ডিজিটাল বৈষম্যমুক্ত বিশ্বের রূপকল্প' শীর্ষক সাইড ইভেন্টটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এটুআই-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়। গাম্বিয়া, উগান্ডা, ঘানা, সোমালিয়া, সাও টোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপের মন্ত্রী ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, জাতিসংঘ সচিবালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন এবং এটুআই-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ই-কোয়ালিটি সেন্টারের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে– সাউথ-সাউথ সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত বিভাজন দূর করা। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠিত এই সেন্টারটি সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার, গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিশ্বের দেশগুলোর মাঝে প্রযুক্তিগত পার্থক্য দূরীকরণে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে– বৈশ্বিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, গবেষণা এবং অর্থনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে সমতামূলক ডিজিটাল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ।

প্রতিবেদন: শাওন আহমেদ

স্তন ক্যান্সারকে ভয় নয় সচেতন হয়ে জীবন বাঁচাই

জেসিকা হোসেন

১০ই অক্টোবর পালিত হয় বিশ্ব স্তন ক্যান্সার সচেতনতা দিবস। স্তন ক্যান্সার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে ২০১৩ সাল থেকে এই দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। প্রতিবছরের মতো এবারো বাংলাদেশে ১০ই অক্টোবরকে স্তন ক্যান্সার সচেতনতা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। এ বছরের প্রতিপাদ্য– 'স্ক্রিনিং জীবন বাঁচায়'। এ উপলক্ষে দেশব্যাপী ছিল পথ সভা, আলোচনাসভা, শোভাযাত্রা, লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি নানা আয়োজন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে, সারা বিশ্বে সাড়ে ১০ কোটি নারী ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। আর বাংলাদেশে প্রতিবছর এ সংখ্যা ১৫ হাজারের বেশি। এদের মধ্যে ৯৮ শতাংশের বেশি নারী, তবে অল্প সংখ্যক পুরুষও স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হন।

গ্লোবোক্যান-এর তথ্য অনুযায়ী, নীরব ঘাতক স্তন ক্যান্সার। প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রায় তেরো হাজার নারী নতুন করে এই ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। মারা যায় প্রায় আট হাজার। আক্রান্তর তুলনায় মৃত্যুহার অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, নারীদের সংকোচবোধ আর দেরিতে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া এর অন্যতম প্রধান কারণ।

শরীরের কোনো স্থানে অস্বাভাবিক কোষের বৃদ্ধি হলে সেটাকে সাধারণত টিউমার বলে। স্তনে হতে পারে দুই ধরনের টিউমার যথা– বিনাইন টিউমার ও ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। বিনাইনের অবস্থান তার উৎপত্তি স্থলে সীমাবদ্ধ থাকলেও ম্যালিগন্যান্ট টিউমার আগ্রাসী ধরনের যা রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে দূরের বা কাছের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা গ্রন্থিকে আক্রান্ত করে। আর স্তনের ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হচ্ছে ক্যান্সার যা সাধারণত দুধবাহী নালিতে হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য টিস্যু থেকেও শুরু হতে পারে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একটি পিণ্ড বা চাকা হিসেবে প্রথমে দেখা দেয় এবং আস্তে আস্তে বড়ো হয়ে শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। স্তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকার কারণে বাহুমূলেও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

স্তন ক্যান্সারের কারণসমূহ

১. যেসব নারীর বয়স ৫০ বছরের বেশি তাদের স্তন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে;
২. মা-খালাদের থাকলে সন্তানদের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে;
৩. যেসব মায়েরা সন্তানকে কখনো স্তন্যপান করাননি তাদের স্তন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি;
৪. যাদের তুলনামূলক কম বয়সে ঋতুস্রাব শুরু হয় ও দেরিতে ঋতুস্রাব বন্ধ হয় তাদের স্তন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি;
৫. অবিবাহিতা বা সন্তানহীনা নারীদের মধ্যে স্তন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি;
৬. ৩০ বছরের পরে যারা প্রথম মা হয়েছেন তাদের স্তন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি;
৭. একাধারে অনেকদিন (১০ বছর বা বেশি) জন্মনিরোধক বড়ি খেলে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বেড়ে যায় এবং
৮. উপরের কারণগুলো স্তন ক্যান্সারের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়তে থাকে, তাই নির্দিষ্ট বয়সের পর থেকে (৩০ বছর) সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

স্তন ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণসমূহ

- স্তনের বোটা থেকে কিছু বের হওয়া,
- স্তনের ভেতর চাকা (lump) অনুভব করা,
- স্তনে ব্যথা অনুভব করা,
- স্তনের আকারে লক্ষণীয় পরিবর্তন,
- স্তনের ত্বকে ঘাঁ দেখা দেওয়া
- স্তনের ত্বকে লালচে ভাব বা লালচে দাগ দেখা দেওয়া।

উপরের লক্ষণগুলোর যে-কোনো একটি দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরি, যা স্তন ক্যান্সারের ভয়াবহতা ও মৃত্যু থেকে রক্ষা করবে।

স্তন ক্যান্সার সাধারণত দুইভাবে শনাক্ত করা যায়

১. স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে
২. রোগ নির্ণয়ের মাধ্যমে

স্ক্রিনিং আবার দুইভাবে করা যায়

১. নিজে নিজে স্তন পরীক্ষা করা
২. ডাক্তার বা নার্সের সাহায্যে পরীক্ষা করা

৫০ থেকে ৭০ বছর বয়সি নারীদের প্রতি তিন বছর পর পর ব্রেস্ট স্ক্রিনিং বা ম্যামোগ্রাম করানো উচিত। ম্যামোগ্রাম হচ্ছে– এক্সরের মাধ্যমে নারীদের স্তনের অবস্থা পরীক্ষা করা। সাধারণত প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সার এত ছোটো থাকে যে বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব হয় না। কিন্তু ম্যামোগ্রামের মাধ্যমে খুব ছোটো থাকা অবস্থাতেই বা প্রাথমিক পর্যায়েই ক্যান্সার নির্ণয় করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পরলে ক্যান্সার থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রচুর থাকে। আর এই পরীক্ষার জন্য মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে। এমআরআই এবং বায়োপসি-এর মাধ্যমেও স্তন ক্যান্সার নির্ণয় করা হয়ে থাকে। স্তন ক্যান্সারের শনাক্তকরণের পরবর্তী পর্যায় হলো– এর সঠিক চিকিৎসা করা। স্তন ক্যান্সারের যে চিকিৎসাগুলো রয়েছে তাহলো– সার্জারি, কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি ও হরমোন থেরাপি, সার্জারির মধ্যেও বিভিন্ন ধরন রয়েছে। কোন ধরনের চিকিৎসা রোগীর জন্য উপযুক্ত তা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সিদ্ধান্ত নেবেন।

আমাদের দেশে এখন ক্যান্সারের পূর্ণ চিকিৎসা সম্ভব। বাংলাদেশ ক্যান্সার ইনস্টিটিউটসহ সরকারি-বেসরকারি সব জায়গাতেই স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসা রয়েছে। সরকারিভাবে স্তন ক্যান্সার নিরাময়ে খরচ হয় পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা। অনেকে আবার বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সুবিধা পেয়ে থাকেন। অতএব স্তন ক্যান্সারকে ভয় না পেয়ে সচেতন হলে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। স্তন ক্যান্সারকে ভয় নয়: সচেতন হয়ে জীবন বাঁচাই।

জেসিকা হোসেন: প্রাবন্ধিক

আলোর পাখি

মোজাম্মেল হক নিয়োগী

লেকের ফাইটোপ্লাঙ্কটনগুলোর সবুজ রং বদলে গিয়ে রক্ত রং ধারণ করার পরেও খোপের সোনালি পালকের পায়রাটি চোখ বন্ধ করে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় সর্ব কনিষ্ঠ আত্মাটির বাতাসে ভেসে যাওয়ার অপেক্ষা করছিল কি না তা বলা মুশকিল। তবে সে হয়ত এমনই একটি ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছিল অথবা করছিল না; হয়ত ভাবছিল একটি কচি পাতার মতো কোমল নরম বুকের ভেতরে আত্মাটি নিজের কুঠুরিতেই থাকবে; অথবা এমনও হতে পারে যে, সে চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করছিল যাতে কোমল আত্মাটি অক্ষত অবস্থাতেই থাকে। কিন্তু সে প্রার্থনা আর পূরণ হয়নি; ভয়ংকর দানবের প্রজাতির রুদ্রমূর্তির এক মুচো পাষণ্ড ওর হাত ধরে– 'আয়, তোর মায়ের কাছে নিয়ে যাই' বলে টেনেহিঁচড়ে যখন দোতলায় নিয়ে যাচ্ছিল তখন সোনালি পালকের পায়রাটি প্রার্থনা বন্ধ করে সর্বশেষ একটি বজ্রনিনাদ শব্দের জন্যই হয়ত অপেক্ষা করছিল অথবা অন্যকিছু ভাবছিল। কিন্তু মুহূর্তেই দোতলা বাড়িটি কেঁপে ওঠার পর সোনালি পালকের পায়রাটি চরম ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায়, ক্রোধে দানবদের ধিক্কার দিতে দিতে আকাশে উড়তে লাগল। উড়তে উড়তে সে দেখতে পেল কতিপয় মানুষ যারা সাতশো ক্রোশে দূরের কোনো এক ভূখণ্ডের হিংস্র মানুষের লেবাসে নিজেদের দেখতে পছন্দ করে তাদের, সেই সাতশো ক্রোশের নালায়েক হিংস্র মানুষদের প্রতি জন্মজন্মান্তরের লালিত প্রেমে কাতর, সেইসব মানুষ উল্লাসে পথে নেমেছে; কিছু সিপাহী ঠোঁটে শিস বাজিয়ে বিলাসবহুল প্রাসাদের বাথরুমে ক্ষৌরকর্মে নিয়োজিত যাদের বুকের ভেতরে মৃদু আনন্দের ঢেউ খেলছে এবং মোহাচ্ছন্ন খেলোয়াড়ের ট্রাম্পকার্ড ছাড়ার মতো উচ্ছ্বাসের প্রকাশ করল, 'সো হোয়াট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজ দেয়ার।'

সোনালি পালকের পায়রাটি উড়তে উড়তে একটি ভাগাড়ের উপর গিয়ে স্থির হয়ে পর্যবেক্ষণ করল এক অদ্ভুত জোকারের পদতলে অপাঙ্‌ক্তেয় কতিপয় দানব পুষ্পস্তবক বর্ষণ করে স্তুতিকীর্তন করছে এবং সেখানকার নানারকম গুঞ্জনও বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল যেগুলো শৃগাল-শ্বাপদের মুখের ভাষার মতোই মনে হচ্ছিল।

অতঃপর সোনালি পালকের পায়রাটি বদ্বীপ পরিভ্রমণ করতে লাগল আর দেখতে লাগল মাটির কণায় এক প্রকার লোহিতকণা সঞ্চিত হচ্ছে; বৃক্ষরাজির সমস্ত পত্রপল্লব স্থির, শ্রাবণের ধারায় প্রবাহমান পদ্মা-মেঘনা-যমুনা স্রোতহীন নিশ্চল, ভোরের আলোয় জেগে ওঠা বিহঙ্গরা কলকাকলিহীন স্তব্ধ, বিকল পালকে পাথরের জড়তায় জরাগ্রস্ত উড্ডয়ন অক্ষম; আর সেই বদ্বীপের মানুষদের বুকে ক্রমাগত বেড়ে উঠছে এক অভাবনীয় বরফের পাহাড়। অথবা এমনও তার মনে হতে পারে যে, হিমালয়ের স্তূপীকৃত বরফ ক্রমধারায় দক্ষিণে ধাবিত হয়ে এখানেও বিস্তৃত হচ্ছে।

অতঃপর বরফের নিস্তব্ধ একটি দেশে কী করে থাকে সোনালি পালকের পায়রা?

উড়ছে তো উড়ছেই সোনালি পালকের পায়রা। উড়তে উড়তে এক মেরু পার হয়ে অন্য মেরুতে। কোথায় তার গন্তব্য? কোথায় তার শেষ থামা? জানে না সে নিজেও। যেমন জানে না মাটির মতো স্তব্ধ দেশের মানুষেরা তাদের বুকের ওপর থেকে বরফের পাহাড় কখনও সরে যাবে কি না? যেমন জানে না কতিপয় দানবেরা ভাগাড়ের জোকারের আনুকূল্যে কোনো রঙিন সাম্পানে কখন বের হবে সমুদ্রের প্রমোদভ্রমণে।

সোনালি পালকের পায়রাটি উড়তে উড়তে ক্লান্ত হয়ে এক সময় একটি সাদা মানুষের দেশে গিয়ে থিতু হয়। ক্লান্তি আর অবসাদে দুচোখে দুই রাজ্যের ঘুমে আক্রান্ত সুবিস্তৃত তৃণভূমির পাশে বৃষ্টিস্নাত পল্লবিত সতেজ ওকবৃক্ষের ডালে বসে ঘুমোতে চাইল। কিন্তু ঘুম কি আর আসে চোখে? তার আত্মার প্রাচীরে একটি শব্দ বার বার প্রতিধ্বনিত হয়; একটি ছোট্ট আত্মার ভয়ার্ত আর্তনাদের করুণ মিনতি, 'আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাও।' সে কি তার মায়ের কাছে যেতে পেরেছিল? মায়ের স্নেহার্দ্র হাতের স্পর্শ কি পেয়েছিল? সোনালি পালকের পায়রা আত্মার প্রাচীরে সেই প্রতিধ্বনি যখনই বিক্ষিপ্ত হয় তখনই সে ভয়ার্ত চোখে জেগে ওঠে। তার চোখে আর ঘুম আসে না। ঘুম আসে না।

অতঃপর সোনালি পালকের পায়রা অনুসন্ধান করে বেড়ায় মানুষ। যে মানুষের রক্তমাংসের শরীরের ভেতরে আছে আলোর আভা, আর আছে শব্দের তরঙ্গ। একসময় পেয়ে যায় সেখানে কিছু মানুষ আর একজন নাদান কবি। কবিও ছিলেন সেখানে এক উৎসবমুখর সন্ধ্যায়, কবিতার ছন্দে ছন্দে আর উচ্ছল হাসির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত বাতাসের তরঙ্গে তারা ভেসে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই কবি থেমে গেল, থেমে গেল কবিতার ছন্দ। পেছনে ফিরে হাঁটতে শুরু করল এক অজানার দেশে আর তখন কী এক মর্মভেদী আর্তনাদ শুরু হয়ে গেল মুহূর্তেই যা সোনালি পালকের পায়রা কখনই ভাবতে পারেনি। অথচ তা-ই হলো। তাকেও সে দৃশ্যই দেখতে হলো যে, একজন উচ্ছ্বসিত কবি কী করে এতটা বেতাল সুরতরঙ্গের নিজের লালিত ছন্দকে নির্বাসন দিতে পারে। উচ্ছ্বাসিত মানুষেরা কি শুনেছে লেকের সমস্ত প্লাঙ্কটন রক্তের লোহিত কণার মতো লাল হয়ে গেছে? হয়ত শুনেছে।

অতঃপর সেই সাদা মানুষের দেশের তৃণভূমির ওকবৃক্ষের শাখায় বসে সোনালি পালকের পায়রা দেখতে পায় দুটি আলোর পাখি। আর সেই আলোর পাখি দুটির খাঁচার চারপাশে এক আশ্চর্য ব্যূহ নির্মাণ করা হয়েছে যাতে হিংস্র দানবের নখরে বিক্ষত না হয়। কিন্তু হলে কী হবে? সেই আলোর পাখিরা বুকের ভেতরে লুকিয়ে রাখা আর্তনাদে সমস্ত তৃণভূমি কাঁপিয়ে তোলে ক্ষণে ক্ষণে। থেমে থেমে আকাশ থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামে। আর তারা সেই ছোট্ট আত্মাটিকে ভুলতে না পেরে তার জন্য কেনা জড়পদার্থগুলোর ভাঁজে ভাঁজে খুঁজে ফেরে ভালোবাসার কষ্ট; বুকে জড়িয়ে ভেজায় চোখের জলে। একদিন সোনালি পালকের পায়রাটি দেখে এই একজোড়া আলোর পাখির চোখের নির্মল জল গড়িয়ে গড়িয়ে সেই বদ্বীপের লেকের পানির সঙ্গে মিশে গেল।

অতঃপর একদিন কতিপয় মানুষের মনে হলো আলোর জোড়াপাখি অন্যত্র সরে যাওয়া শ্রেয়। তারা এক সুরক্ষিত খাঁচায় ভরে এলো বদ্বীপের পাশের একটি দেশে। এই দেশে মানুষরা একসময় দানবদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল বদ্বীপের মাটি।

এখানে হায়!

আলোর পাখিরা কেমন ছিল?

দিন যায়। রাত হয়। এভাবে খাঁচার ভেতরে আর কত কাল? কত কাল থাকা যায় খাঁচার ভেতরে?

সোনালি পালকের পায়রা আলোর পাখিদের সঙ্গে কথা বলল। সে বলল, তোমাদের দেশ নিরেট স্তব্ধতায় একাকার হয়ে আছে, চলো তাকে জাগিয়ে তোলো। স্তব্ধতার বাঁধ ভেঙে দাও। আঁধারের বাঁধ ভেঙে দাও হে আলোর পাখিরা।

সোনালি পালকের পায়রার কথা শুনে আলোর পাখিরা হাসে। একজন বলে, এভাবে বললেই কী আর যাওয়া যায়? সে দেশ এখনও কতিপয় ভয়ংকর দানবের থাবার নীচে। সে দেশের মাটিতে মানুষের লাশের ছড়াছড়ি, সে দেশের বাতাসে লাশের গন্ধ, সে দেশের পানিতে মানুষের রক্তের প্রবাহ, সে দেশ এখন কতিপয় মেকআপ মারা রমণীবেষ্টিত বন্দুকধারী কতিপয় সিপাহীর থাবার নীচে, সেখানে কী করে যাই বলো?

সোনালি পালকের পায়রা বলে, তোমরা যখনই উড়তে শুরু করবে তখনই বন্দুকধারী সিপাহীরা আতঙ্কিত হবে, মেকআপ মারা রমণীদের মেকআপ ম্লান হয়ে আসবে, কম্পমান হবে সিপাহীদের হস্ত, খসে পড়তে থাকবে তাদের অস্ত্র। চলো, দুর্ভাগা দেশে, যে দেশের মাটিতে এখনও ফলেনি সোনালি শস্য, যে দেশের মাটিতে এখনও চাষ হয়নি সুগন্ধি পুষ্প, যে দেশের মানুষ এখনও শুনেনি স্বপ্নের সংগীত, যে দেশের মানুষেরা এখনও শ্বাপদের তীক্ষ্ণ নখরে ক্ষতবিক্ষত, যে দেশের আকাশে এখনও ছড়ায়নি সোনালি আলোর প্রভা। তোমরাই কেবল পারো সে দেশে ফলাতে সোনালি শস্য, ছড়াতে পারো সুগন্ধি ফুলের সুবাস, মানুষকে শোনাতে পারো স্বপ্নের সংগীত, মানুষকে মুক্ত করতে পারো শ্বাপদের হিংস্র নখর থেকে, আকাশে ছড়াতে পারো সোনালি আলোর প্রভা, চলো আলোর পাখিরা। একবার যাও, দুঃখী দেশের দুঃখী মানুষের চোখের জলের সঙ্গে তোমরাও মেশাও তোমাদের চোখের জল।

অতঃপর সোনালি পালকের পায়রার কথায় একদিন আলোর পাখিরা এদেশে আসতে চাইল। একদিন আলোর পাখি সোনালি পালকের পায়রার সঙ্গে উড়তে উড়তে চলল।

অতঃপর একদিন, স্তব্ধতার বাঁধ ভেঙে সেই কবে, সেই ১৯৮১ সালের জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি এক আলোর পাখি এসে দাঁড়াল লেকের পাশের সেই বাড়িটির সম্মুখে, যে বাড়িটি ছিল একসময় সাড়ে সাত কোটি মানুষের ঠিকানা, যে বাড়িটি ছিল সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিশ্বস্ততা, নির্ভরতা ও শান্তির আশ্রয়, যে বাড়িটি থেকে দানবেরা কেড়ে নিয়েছিল একে একে সমুদয় মানুষের আত্মা, সেই বাড়িটির সম্মুখে।

কিন্তু সিপাহীদের অবরুদ্ধ করে রাখা বিশ্বস্ততা আর নির্ভরতার বাড়ির ফটক বন্ধ থাকায় তার প্রবেশ রোধ্য হলো। ফটকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি আলোর পাখি।

সোনালি পালকের পায়রা আলোর পাখির কানে কানে বলল, দ্যাখো, স্তব্ধতার বাঁধ ভেঙে গেছে, সারা দেশের মানুষ আজ আনন্দোচ্ছ্বাসে মুখরিত, আঁধারের বাঁধ ভেঙে গেছে, সারা দেশে কেমন আলোর জোয়ার; শুনো ছয় বছর ধরে স্তব্ধ পাখিরা আজ কলকাকলিতে মুখরিত, দ্যাখো মানুষের বুকের ওপর বরফের পাহাড়টি ধীরে ধীরে গলে পদ্মা-মেঘনা-যমুনাকে করছে প্রবাহমান, দ্যাখো কেমন বেড়ে উঠছে মাঠে মাঠে সোনালি শস্যের চারা...। তোমার আগমনেই মৃত বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-শস্যরা পল্লবিত, পুষ্পবতী ও ফলবতী– তুমি অপেক্ষা করো আর উর্বর মৃত্তিকায় স্বপ্নের বীজ বুনে যাও। একদিন দেখবে সোনার বাংলাদেশে সোনা ফলছে।

———○———

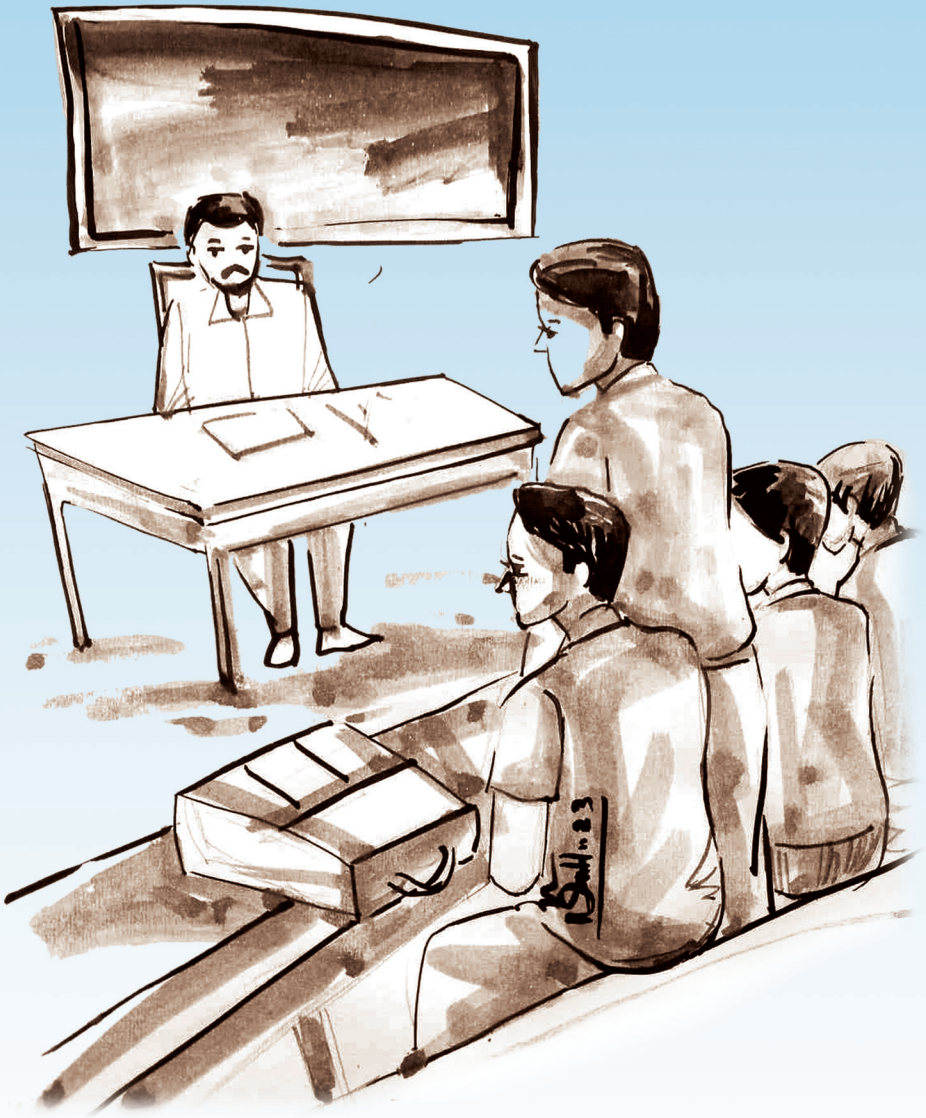

সেদিন ক্লাসে শেখ রাসেলের গল্প বলেছিল সজল

অমিত কুমার কুণ্ডু

আমি তখন ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। জানুয়ারি মাস। সকালে বেশ শীত পড়ে। বাবার কিনে দেওয়া নতুন সোয়েটার পরে স্কুলে যাবো। স্কুল ইউনিফর্মের উপরে সাদা-কালো হাফ হাতা সোয়েটার। ইউনিফর্ম বলতে সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট, সাদা মোজা ও সাদা কেডস। নিজেকে স্কুল যাবার আগে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার একবার দেখে নিলাম। বাহ্, বেশ মানিয়েছে তো।

সদ্য নতুন ক্লাসে ভর্তি হয়েছি। কয়েকদিন ক্লাস হয়েও গেছে। নতুন স্কুল। নতুন বন্ধু। নতুন শ্রেণি। নতুন স্বপ্ন। সবকিছু যখন একটু একটু করে মানিয়ে নিচ্ছি, তখন আমাদের ক্লাসে নতুন একজন ছেলে এসে বসল।

আমাদের কয়েকদিনের চেনা পরিবেশে এক নতুন আগন্তুক। ছেলেটি সপ্রতিভ। মুখে একটা উজ্জ্বলতা আছে। আমাদের পঞ্চাশ জোড়া চোখ হঠাৎই তার দিকে নিবিষ্ট হলো। ক্লাস টিচার তখনও আসেননি। আমরা প্রশ্ন করার আগেই সে নিজের পরিচয় দিলো।

ডাক নাম সজল। পুরো নামটি শাহনেওয়াজ ইসলাম সজল। বাবার বদলির চাকরি। উপজেলা ফুড অফিসার। আমাদের উপজেলায় সদ্য যোগ দিয়েছেন। সপরিবার উপজেলা কোয়ার্টারে উঠেছেন। প্রথমদিনে মোটামুটি এতটুকুই জানতে পারলাম।

কথা তখনও চলছিল, হঠাৎ অ্যাটেনডেন্স খাতা, চক-ডাস্টার ও একটা সরু বেত নিয়ে ক্লাস টিচার আমাদের শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলেন। আমরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে স্যারকে শ্রদ্ধা জানালাম। সালাম বিনিময় হলো।

রোল কলের সময় সবার শেষে সজলের নামটি ডাকলেন স্যার। স্কুল থেকে অ্যাটেনডেন্স খাতায় তার নামটি তুলে দেওয়া হয়েছে। ভর্তির সিরিয়াল অনুযায়ী রোলের সিরিয়াল। ক্রমিক নম্বরের পরিবর্তন হবে পরের বছর বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্ট অনুযায়ী। এ বছর আগে আগে যারা ভর্তি হয়েছে, সময়ানুবর্তিতার পুরস্কার

হিসেবে তারাই অগ্রগণ্য। সজল যেহেতু সবার শেষে এসেছে, ওর ক্রমিক নম্বরও সবার শেষে।

স্যারের নাম ডাকার প্রতি উত্তরে সজল, 'ইয়েস স্যার'– বলে দাঁড়িয়ে রইল। বুদ্ধিমান ছেলে, আগে থেকেই বুঝেছে স্যারের কাছে নিজের পরিচয় দিতে হবে। স্যারের আদেশে দ্বিতীয় দফা আবার সজলের পরিচয় দিতে হলো। যথারীতি ক্লাসের পর ক্লাস চলল। সেদিন ছুটি হয়ে গেলে যে যার বাড়ি চলে গেলাম। সজলের সঙ্গে আলাদা করে আর পরিচয় হয়ে উঠল না। হৃদয়ে বন্ধুত্বের একটা মিষ্টি আশা সঞ্চার হয়ে থাকল।

সজলের ছিল একজোড়া সজল নেত্র। ধবধবে ফরসা গায়ের রং। উপরের পাটির দাঁত একটু উঁচু। সে কারণে বেমানান লাগত না। মুখের সঙ্গে সহজেই মানিয়ে যেত। গোঁফের গোড়ায় হালকা সোনালি লোম ছিল। চুল মানানসই বড়ো রাখত। দীর্ঘ কপাল সেই কুঁচকুঁচে কালো চুলে ঢেকে যেত।

সজলের মূল পরিচয় পেলাম কয়েকদিন পরে। তখন অবশ্য আমাদের সঙ্গে ও বেশ মিশে গেছে। বন্ধুত্বও পাকা হয়েছে। আসল কথা তখনও জানতে পারিনি।

জানতে পারলাম আমাদের স্কুলের ওয়াজেদ স্যারের ক্লাসে। স্যার স্কুলে করণিকের কাজ করতেন। দু'একটা ক্লাসও নিতে হতো। এমনিতে পড়াতেন ভালো। দারুণ ছবি আঁকার হাত ছিল। চারু ও কারুকলার ক্লাস স্যারই নিতেন। এছাড়া সমাজবিজ্ঞান বা অন্যান্য ক্লাসও নিতে হতো মাঝে মধ্যে। অনেকদিন অফিসের জটিল হিসাবনিকাশ করে স্যার ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। তখন সময় কাটানোর জন্য আমাদের কাছ থেকে গল্প শুনতে চাইতেন।

একদিন গল্প শোনানোর জন্য সজলের ডাক পড়ল। সত্যি বলতে কী, আমাদের সেই ছোট্ট জীবনে এত দারুণ গল্প কথক ইতঃপূর্বে আর দেখিনি।

এরপর প্রায়ই সজলের ডাক পড়ত। আমরাও মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওর বলা গল্প শুনতাম। কখনও গল্পের রাজ্যে হারিয়ে যেতাম। কখনও হেসে লুটোপুটি খেতাম। কয়েকদিনের মধ্যেই গল্প কথক সজল আমাদের হিরো হয়ে গেল।

এভাবে চলতে চলতে একদিন ১৮ই অক্টোবর এলো। যথারীতি সেদিনও সজলের ডাক পড়ল গল্প শোনানোর। সজল সেদিন আর রূপকথার গল্প শোনালো না। সজল শোনালো ইতিহাসের এক নির্মম সত্য ঘটনা। সজল শোনালো শেখ রাসেলের গল্প।

আমরা সজলের মুখ থেকেই শুনলাম শেখ রাসেল, সেই অমর এক নাম, যার জন্ম হয়েছিল ১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর। যে আমাদের মতোই ছোটো ছিল। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের ছাত্র ছিল। আর ছিল ভীষণ মানবিক।

খুনিদের নির্মম বুলেটের আঘাতে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করেছিল রাসেল। বাঁচার আকুতি জানিয়েছিল শেখ রাসেল। কিন্তু বাঁচতে পারেনি। মায়ের কাছে যেতে চেয়েছিল। খুনিরা যেতে দেয়নি। খুনিরা আগেই মাকে হত্যা করেছিল। বাবার কাছে যেতে চেয়েও যেতে পারেনি। সবার আগে তো বাবাকেই হত্যা করেছিল। বোনদের কাছে যেতে চেয়েছিল। খুনিরা সেখানেও যেতে দেয়নি।

রাসেল মৃত্যুর আগে শেষবারের মতো বলেছিল, 'আমাকে হাসু আপুর কাছে পাঠিয়ে দিন।' খুনিরা এতটাই নির্মম ছিল যে, এই ছোট্ট নিষ্পাপ শিশুর এই এতটুকু ইচ্ছেও তারা পূরণ করেনি। রাসেলের উপর তাদের এতটুকু মায়া হয়নি। খুনিরা মা, বাবা, দুই ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী, চাচা সবার লাশের পাশ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে সবার শেষে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল শেখ রাসেলকে। কী মর্মান্তিক! কী হৃদয় বিদারক!

সেদিন শেখ রাসেলের জন্মদিনে শেখ রাসেলের গল্প শুনে আমরা ক্লাসশুদ্ধ সকলে কেঁদেছিলাম। আমাদের মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়েছিল। আমরা শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছিলাম।

রাসেল তো তখন আমাদের মতোই শিশু ছিল। কত স্বপ্ন ছিল তার দুই চোখে। কী মিষ্টি হাসি ছিল তার মুখে। কত ভালোবাসা ছিল হৃদয়ে। সেই রাসেলকে কি না খুনিরা হত্যা করল?

বাড়ির পোষা কবুতরের মাংস পর্যন্ত খেত না যে শিশুটি, স্কুলের গেটে বাদাম বিক্রি করা ফেরিওয়ালা ছেলেটির সঙ্গেও বন্ধুত্ব হয়েছিল যার, মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে সকলকে যে আপন করে রাখত, সেই শিশুটিকেও ছাড়েনি খুনির নির্মম বুলেট!

খুনি ছাড়েনি গ্রামের বাড়ি গিয়ে দাতা হয়ে যেত যে ছেলেটি, তাকে। খুনিরা ছাড়েনি খেলার মাঠে নেতা হয়ে যেত যে, তাকে। ছাড়েনি সকলের মধ্যে একজন হয়ে ওঠা রাসেলকে। অনেকের মধ্যে অনন্য রাসেলকে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের মতোই বিরাট হৃদয়ের অধিকারী হয়েছিল যে, মমতাময়ী মায়ের মতোই কোমল মনের অধিকারী হয়েছিল যে, সেই রাসেল, সেই ছোট্ট রাসেলের এই করুণ মৃত্যুর কথা শুনে আমাদের শিশুমন ভেঙে পড়েছিল।

আমার মনে আছে, সেদিন দুপুরে আমি একটুও ভাত খেতে পারছিলাম না। যখনই মুখে খাবার তুলছিলাম, তখনই রাসেলের

অশ্রুসিক্ত মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। আর বুক ফেটে কান্না পাচ্ছিল।

সজলের মুখে এই গল্প শোনার পরে সজলকে প্রশ্ন করেছিলাম, ‘সজল, তুমি শেখ রাসেলের কথা কোথায় শুনেছ?’ সজল বলেছিল, ‘মায়ের কাছ থেকে।’ সজলের মুখে ওর মায়ের কথা শোনার পরে আমারও ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিল সজলের মাকে দেখতে। একদিন সেই ইচ্ছাও পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

সজল আমাকে ওর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। সজলের মা অতিথি বৎসল নারী ছিলেন। ছেলের বন্ধুদের সন্তানস্নেহে ভালোবাসতেন। মনে আছে, প্রথম যেদিন সজলদের বাসায় গিয়েছিলাম, সজলের মা ফ্রিজ থেকে খালিশপুরের চমচম বের করে খাইয়েছিলেন। তখনও আমাদের বাসায় ফ্রিজ আসেনি। গ্রীষ্মের দুপুরে ঠান্ডা ঠান্ডা সেই চমচমের অপরূপ স্বাদ এখনও যেন মুখে লেগে আছে।

সজল আমাদের বাড়িতেও অনেকবার এসেছে। আমার মনে আছে, যেদিন প্রথম এসেছিল, মা সজলকে লক্ষ্মী পূজায় তৈরি করা নারকেলের নাড়ু, মুড়ি-মুরকি খেতে দিয়েছিলেন। সজল অনেকবার মায়ের হাতে তৈরি করা সেই নারকেল নাড়ুর প্রশংসা করেছিল।

এই সজলের মুখেই একদিন শুনেছিলাম, সজলের বাবা পূর্বে ধূমপান করতেন। একদিন তিনি বাড়িতে ঘোষণা করলেন, ‘আজ থেকে আমি সিগারেট ছেড়ে দিলাম।’ বাড়ির সবাই খুবই খুশি।

আঙ্কেল খুশি দ্বিগুণ করে দিলেন, যখন বললেন, ‘আমার এক বছরের সিগারেট খাওয়ার টাকা জমিয়ে আগামী বছর তোমাদের তাজমহল দেখাতে নিয়ে যাব।’

আঙ্কেল তার কথা রেখেছিলেন। সজল ক্লাস ফোরের অ্যানুয়াল ফাইনাল দেবার পরই তাজমহল দেখতে পেরেছিল। তাজমহলের গল্প। ট্রেনে করে মরুভূমির উপর দিয়ে যাবার গল্প। ট্রেন থেকে জ্যোৎস্না রাতে চড়ে বেড়ানো ময়ূরের নাচ দেখার গল্প। আরও কত গল্পই না সজলের ঝুলিতে ছিল।

সজল বেশিদিন স্কুলে ছিল না। সম্ভবত ক্লাস এইটে পড়ার সময় ওর বাবা বদলি হয়ে যান। তারপর আর সজলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি।

তখন মোবাইল ছিল না। ওই বয়সে চিঠি লেখার কথাও ভাবতে পারতাম না। সময় বয়ে চলেছে। আমরা একের পর এক ক্লাসে উঠেছি। স্কুলের গণ্ডি পেড়িয়ে কলেজ। তারপর কত কিই না ঘটে গেল জীবনে।

সেই কিশোরকালের বন্ধু তবুও হৃদয়ে একই রকম জায়গা নিয়ে রয়ে গেল। সজল মেধাবী ছাত্র ছিল। বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল। নিশ্চয় বড়ো মনের মানুষ হয়েছে। ছোটোবেলার যে বিষয়টা মনের মধ্যে বেদনা জাগিয়ে যায়, তা সজলকে হারিয়ে ফেলার ঘটনা। আজ এই ১৮ই অক্টোবরে যখন দেশজুড়ে শেখ রাসেলের জন্মদিন পালিত হচ্ছে, তখন আমার ভীষণভাবে দুটি মুখের কথা মনে পড়ছে। এক, শেখ রাসেলের মুখ। আর এক বন্ধু সজলের মুখ।

শেখ রাসেল তো চিরতরে হারিয়ে গেছে আমাদের মধ্য থেকে। সজলও কোথায় আছে জানি না। জানার সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত। যদি কাকতালীয়ভাবে সজলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, তবে কী কথা বলব প্রথমে? কেমন আছিস? কোথায় আছিস? কী করছিস? বিয়ে করেছিস না কী? আঙ্কেল-আন্টি কেমন আছে? ভাবি কী করে? কটা বাচ্চা তোর?

এসব প্রশ্ন করব? না চোখ দিয়ে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়বে? সজলকে আলিঙ্গন করে অনেকক্ষণ ধরে থাকব কি? জানি না। ঠিক কী হবে সত্যিই জানি না। আদৌ দেখা হবে কি সজলের সঙ্গে? তারও তো ঠিক নেই। সবই অনিশ্চিত। সবই কল্পনা। ‘তবু আশা বেঁধে রাখি। তবু দীপ জ্বেলে রাখি।’

আজ শেখ রাসেলের জন্মদিনে সজলের কথা বলার দুইটি কারণ আছে। এক, সজল যেমন হারিয়ে গিয়েও আমার মন থেকে হারায়নি। শেখ রাসেলও তেমন হারিয়ে গিয়েও আমাদের মন থেকে হারায়নি। এই জাতি যতদিন থাকবে, বাংলা ও বাঙালি যতদিন থাকবে, শেখ রাসেলও ততদিন চির ভাস্মর হয়ে জেগে থাকবে।

আর দুই, সজলের মনে যে সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো ছিল, যে মননশীলতা ছিল, তার বিকাশে শেখ রাসেলের প্রচ্ছন্ন ভূমিকা ছিল। রাসেলকে সজল ছোটোদের আইকন মনে করত। আর আমাদের মনে সেই ভাবনার বীজ বুনে দিয়েছিল। আমাদের মনে শেখ রাসেলের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তুলেছিল।

এই যে বই পড়া, একটু লেখার চেষ্টা করা, এসবের পেছনে সজলের পরোক্ষ অনুপ্রেরণা আছে। সজল হয়ত সেটা জানতেও পারল না। তাতে কী? আমি তো জানি।

আর এই বাঙালি জাতি যে শেখ রাসেলের জন্য আজও অশ্রু বিসর্জন করে, সেটাও হয়ত শেখ রাসেল জানে না। তাতে কী, আমাদের হৃদয় মধ্যে যে জন বসে সবকিছু দেখছেন, সবকিছু শুনছেন, তিনি তো উপলব্ধি করছেন আমাদের মর্মবেদনা। তিনি তো দেখছেন আমাদের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ। তিনি তো শুনছেন আমাদের প্রার্থনা। এই প্রার্থনা শেখ রাসেলকে অমর করে রাখবে। চিরন্তন করে রাখবে। শাশ্বত করে রাখবে।

সচিত্র বাংলাদেশ এখন
ফেসবুকে

ভিজিট করুন
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

শহিদ শিশু শেখ রাসেলের জন্মদিন

বেগম শামসুন নাহার

আকাশ ঢেকে ছিল মেঘে
তখনও সূর্য ওঠেনি জেগে,
ফুল-পাখিরা কথা কয়নি কারো সনে
ইতিহাসের সেই কালো অধ্যায়–
১৫ আগস্ট উনিশশো পঁচাত্তর সাল।
কোমল প্রাণে জেগেছিল ভয়,
ঘাতকদের বলেছিলে তুমি–
'আমি মায়ের কাছে যাবো– নরপিশাচেরা
মিথ্যা বলেছিল, মায়ের কোলের কাছেই
ছুড়ে দিলো বুলেটের অগ্নিবাণ–
মায়ের কোলেই শহিদ হলে তুমি, নিরপরাধ শিশু এক,
তবুও এই বাংলার নারী, পুরুষ, শিশু-কিশোর ভোলেনি তোমায়–
আজও তাই কাঁদে, বাঙালি প্রাণ,
কাঁদে হাসু আপা, রেহানা আপুর মন।
তোমার রক্ত ঋণে, কাঁদে বাংলার মা-মাটি।
আজ 'রাসেল' সোনার জন্মদিন-শুভ জন্মদিন।
শহিদের বেশে গর্ব ভরে–
এসো তুমি! এ মাটি মায়ের কোলে,
বার বার এসো–
শুভ জন্মদিনের, শুভক্ষণে ।
তুমি শহিদ, তুমি অমর, বাংলার গর্ব,
শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় স্মরণ করি এদিনে
আমরা তোমায়। তুমি জাতীয় বীর যোদ্ধা।

সবার মাঝে তুমি

বিচিত্র কুমার

রাসেল সোনা জাদুর কণা
ও আকাশের চাঁদ,
তোমার শুভ জন্মদিনে
ভাঙে খুশির বাঁধ।

ফুল হয়ে ফোটো তুমি
প্রভাতবেলার পাখি,
রোদের সাথে হেসে খেলে
জুড়াই তোমার আঁখি।

নীল আকাশে তোমার বাড়ি
জোছনালতার পাখা,
রংতুলিতে স্বপ্ন স্মৃতি
মধুর সময় আঁকা।

তারার দেশে থাকো তুমি
সকাল বিকাল সাঁঝে,
ফুলপাখি আর প্রজাপ্রতি
পায়রাগুলোর মাঝে।

হয়ে ভোরের পাখি

জাহানারা জানি

রাসেল সোনা ঘরে আয়
সন্ধ্যা নামে ঝিলের গায়
রাসেল রে কোথায় গেলি
তোর কথা আর কারে বলি।
তোর কথা যেই মনে হয়
দুচোখেতে বন্যা বয়
ধানমন্ডি লেকের ধারে
হাসু আপা খোঁজে কারে?
তোর খোঁজেতে বেলা যায়
রাসেল রে তুই ঘরে আয়
ওরে তাজা ফুলের কলি
রাসেল রে তুই কোথায় গেলি?
রাসেল রে তুই ফিরে আয়
সন্ধ্যা নামে লেকের গায় ।
বত্রিশ নম্বর বাড়ির ভেতর
ছোট্ট যে তোর ঘরে–
তোর আদরের খেলনাগুলো
কেঁদে কেঁদে মরে
রাসেল সোনা জাদু রে তুই
আয় ফিরে আয় ঘরে
শিউলি গাছে ফুলকলিরা
নিত্যি ডাকে তোরে।
কেন কান্দো হাসু আপু
তোলো সজল আঁখি
চেয়ে দেখ ডাকছি তোমায়
হয়ে ভোরের পাখি!

রাসেল নামের ফুল

আলমগীর কবির

থাকত বুবুর পিছু পিছু
আদর সোহাগ পাবার জন্য,

খেলার ফাঁকে ব্যস্ত হতো
মায়ের কোলে যাবার জন্য ।

কবুতরের পিছু পিছু
ছুটতো সে রোজ খাবার হাতে,
কত গল্প ছিল যে তার
দেশদরদি বাবার সাথে!

ফোটার আগেই প্রিয় সে ফুল
একটি রাতে ঝরে গেল,
ব্যথার মেঘে হৃদয় আকাশ
এক নিমেষেই ভরে গেল!

হিমালয়-দুহিতার সম্মোহনী

হাসান হাফিজ

চর্যাপদ, সে এক আশ্চর্য পুথি, জোছনাসিক্ত,
তুমি হলে আবিষ্কৃত, অভিষিক্ত, প্রকাশিত।
নেপালের রাজদরবারে ছিল স্মৃতিরেশ অধিষ্ঠাননন্দিনী তোমার
হিমালয়-দুহিতার নিভৃতি আদরে-ওমে ছিলে তুমি আড়ালবাসিনী,
বাংলা ভাষা, প্রত্নঘুমে আদি সেই নিদর্শন...
বরফে-পাথরে দেখছি রুচিমান বন্ধুতা ও ঐক্য সম্মিলন
দিগন্তবিস্তারী সৌধ শূন্যচুম্বী ধবলিয়া পর্বতমালার
কাষ্ঠমণ্ডপের নাম বদলে গিয়ে হয়ে উঠল কাঠমাণ্ডু
এভারেস্ট ধরিত্রীর সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ কী অহং গম্ভীরতা দ্যুতি
তোমার কী সম্মোহন, চোরাটান, জাদু ও মমতা
বিশ্ববাসী তোমার উচ্চতা ছুঁতে, দুঃসাহসে ধন্য হতে
প্রবল আবেগে দীপ্ত মরিয়া কাঙাল আর্ত উৎকণ্ঠিত কেন
মানুষ তোমার থেকে উচ্চতা ও মহত্ত্বের, উদাসীন নির্লিপ্তির
শিক্ষা নিতে পারলে বেশ ভালো হয়, স্বস্তি হয়ত মেলে
এ পৃথিবী তখন সামান্য একটু বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে
রক্তারক্তি হানাহানি বিষ পুঁজ পাশবতা কমে যদি বাঁচি...

এ আমার জন্মভিটা এ আমার গ্রাম

অর্ণব আশিক

এ আমার জন্মভিটা এ আমার গ্রাম–
এখানে নিবিড় আকাশ সবুজ প্রকৃতি
আদুল অন্ধকারে সহজ গতির সাথে কথা কয় ;
এখানে নদী জলের তোড়ে ভাঙে তীর
ডুবসাঁতারে অপরাহ্ণ খেলা করে তমাল পল্লবে
মেঘমল্লারের সাথে।

এখানে ভোরের রোদ্দুর হেসে উঠে
ঝরে পড়ে শিউলি তলায় মায়াময় দৃশ্য
হাঁস-মোরগ-শালিকের ডাকে
এখানে উঠোনজোড়া রোদ্দুর করে খেলা
কিষানের লাঙলের ফলায় সবুজ কলাপাতায়
পান্তার থালায়।

এখানে নিশিতে পূর্ণিমা নামে কলমিলতায়
চাঁদ ঝুঁকে পড়ে ঝলসানো রুটির মতো
কিষানি দাঁড়িয়ে থাকে বিন্দু বিন্দু অপেক্ষায়
অশ্রু টলটল চোখে অমোঘ জ্যোৎস্নায়
চোখে তার ধূসর মায়াবী ছায়া
হৃদয়ে কাব্যগাথা জল ও কাদার।
এখানে শীত নামে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে
অসংখ্য ঝরা পাতার কোলাজে, খেজুর রসের হাঁড়িতে
এখানে কিষানের ফেরারি স্বপ্নগুলো ক্ষতবিক্ষত হয় অন্ধকারে
শৃগালের মতো মানুষের ধূর্তামিতে।

এ আমার জন্মভিটা
তবুও এখানেই ভালোবাসা জমেজমে ক্ষীর হয়
সমস্ত রুক্ষতা কুটিলতা ধুয়ে।

আমার জন্মভূমি

দেলওয়ার বিন রশিদ

সবুজের ছড়াছড়ি সব দিকে দৃষ্টিজুড়ে অপরূপ স্নিগ্ধতা,
এ আমার জন্মভূমি শ্যামল স্বদেশ, বাংলাদেশ
প্রতিনিয়ত এখানে সবুজ ঐশ্বর্য
ঢেউ খেলে
পথের দুধারে বনবনানী পাখির-কলকাকলি মুখর
বিস্তৃত মাঠে মাঠে সরষে ফুলের
হাসি
যেখানে স্বপ্ন আশা স্থির,
জমির চিকন আইলজুড়ে
দূর্বা ঘাসে সকালের কাঁচা রোদে
মুক্তদানা চিক চিক করে
এ আমার জন্মভূমি সবুজ স্বদেশ, এখানে সুখ সৌরভ
বাউলের একতারা, রাখালের বাঁশির সুর,
প্রত্যেহ নতুন প্রেরণা,
নদীর কল্লোলিত ঢেউয়ের বুকে মাঝি নাওয়ের গলুইয়ে বসে
বৈঠা টানে আনমনে
এ যেন সুখের ঠিকানায়
পথচলা
দিঘির জলে শাপলা, পদ্ম ফুলের
গা ঘেঁষে হাঁসরা খেলা করে
পদ্ম পাতায় লাফিয়ে উঠে টেংরা-পুঁটি
হাওয়ার দোলায় নাচে কলমি ফুল,
নিম জারুল হিজল বটের ছায়া ঘেরা
সবুজ মায়ার
এ আমার জন্মভূমি শ্যামল স্বদেশ, বাংলাদেশ।

মন চলে যায় গাঁয়

গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

গ্রামকে বড়ো ভালোবাসি, দিয়ে মন-প্রাণ
ভালোবাসি ফুল বাগানের– ফুলের মধুর ঘ্রাণ।
ভোরে সূর্যের রাঙা হাসি, দারুণ লাগে ভালো
রাঙা সূর্যের রাঙা হাসি, মন করে দেয় আলো।

দেখি যখন পুকুর ঘাটে, শাপলা ফুলের হাসি
বাঁশের ঝাঁড়ে বকের বাসা– দারুণ ভালোবাসি।
তালগাছেতে বাবুই পাখির, বাসা যখন দেখি
মনের মধ্যে গাঁয়ের ছবি– হৃদয়জুড়ে আঁকি।

দুপুরবেলা শ্যামা ঘুঘু, গাছে যখন ডাকে
মন চলে যায় ঐখানেতে– হিজল গাছের বাঁকে।
পুকুর ঘাটের স্বচ্ছ জলে, মাছের ছুটাছুটি
মনটা তখন ধরতে মাছ– করে লুটোপুটি।

দামাল ছেলে ফড়িং ধরতে, যখন মাঠে যায়
দুপুরবেলা রোদের মাঠে– দৌড়ি উদোম গায়।
সন্ধ্যাবেলা গরু নিয়ে, রাখাল ফিরে বাড়ি
পথেরধুলো উড়িয়ে গরু– ফিরছে সারি সারি।

ইচ্ছে করে গোধূলিবেলার– ধুলো মাখি গায়
গ্রামের কথা মনে হলেই মন চলে যায় গাঁয়।

ঋজু

রোকসানা গুলশান

পূর্ণিমার প্যালেট থেকে রং নিয়ে সাজিয়েছি ঢের,
এঁকেছি সহস্র রেডিমেড সকাল!
মেট্রো জীবনের আবহে
সময়ের আরোহ-অবরোহের দিন।
সন্ধেবেলার সন্ধিক্ষণে, অ্যাপার্টমেন্টের অ্যাপার্ট সময়ে
খুঁজি আবার চন্দ্রদ্বীপ–
চেতনার সফ্‌টওয়্যারে।

পশমের পরে উপশম কোথায়?
সে থাকে অন্তরে–
কৃষ্ণগহ্বরে কণিকার বিকিরণে
উপশম জ্যোতির্ময়।
চাহিদা-জোগানের লাভটুকু থাক,
শুধু অফুরন্ত জাগুক–
জল কিংবা খরার দুর্নাম ঘুচে
অক্ষয় হোক দাঁড়াবার ভিত।

আমাদের দুঃখরা ডুবে গেলে;
সুখ ভেসে ওঠে দ্যুতিময়–
স্পন্দিত দেহ-দ্বীপে।

আমার আছে যা

বোরহান মাসুদ

আমার আছে পাতার বাঁশি সবুজ গাঁয়ের মাটি
খাল ও বিলে, নদীর পথে একলা মনে হাঁটি।
বনের ছায়া, উড়াল পাখি আছে মধুর গান
সবুজ খেতে হাওয়ায় দোলে বিন্নি জিরা ধান।

শান্ত বিকেল কোকিল ডাকে সাঁঝের কী যে মায়া
শিমুল জারুল হিজল তমাল আছে বটের ছায়া।
বাদল দিনে সকাল বিকাল হরেক মেঘের খেলা
হাসি-খুশি, গোল্লাছুটে যায় পেরিয়ে বেলা।

কলমিলতা দূর্বাছাওয়া ধানক্ষেতের ওই আল
খেয়াঘাটে মাঝির নাওয়ে উড়ছে রঙিন পাল।
ঝিঁঝিঁ ডাকা রাতের কোলে চাঁদ রুপালি হাসে
তিলের নাড়ু ঢ্যাপের মোয়া খোকা ভালোবাসে।

ছয়টি ঋতুর ফুল ফসলে আঙিনা যায় ভরে
বাউল কবির উদাস গানে মন থাকে না ঘরে।
রসে ভরা আম-কাঁঠালে মনটা ভীষণ মাতে
আমার আছে যত কিছু খুশি থাকি তাতে।

অনন্ত অপার

আবু জাফর আবদুল্লাহ্

পাইনে তৃপ্তি মনে হাসি নামে ডেকে তোমায়
'অনন্যা' নামটি আসলে তোমাকে ভালো মানায়।
তুমি সুন্দর তাই এ নামটি দিলাম আমি।
মন বলছে, আলবৎ খুশি হয়েছ তুমি।

প্রিয়ার গালের একটি তিলের তরে কবি ওমর
দিয়েছেন লিখে সমরখণ্ড, বোখারা সাহসী প্রবর।
তোমার গালের তিলের তরে এতটুক নেই আমার
আছে শুধু ভালোবাসা। তাই তা দিলাম অনন্ত অপার।

আমার দেশ, আমার ভালোবাসা

রুস্তম আলী

আমার অঙ্গীকার–
আমার দেশ, আমার ভালোবাসা।
আমাদের চলার পথে দেশপ্রেম পাথেয়।

দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় ত্যাগ স্বীকার
দেশের জনগণের সেবায় জীবন উৎসর্গ
দেশের প্রতি গভীর আবেগ-অনুভূতি ও মমত্ববোধ
ইসলামের পরিভাষায় দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।

আদর্শিক দেশপ্রেম, মানুষের ক্ষুধা ও চাহিদা মেটায়।
মানুষ মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ দেশপ্রেমের মেলবন্ধন।
ক্ষমা করার দৃঢ়সংকল্প দেশপ্রেমকে মজবুত করে।
আমার আশা, আমার ভরসা
আমার দেশ, আমার ভালোবাসা।

প্রতীক্ষা শেষের ট্রেনে

মনির জামান

জোয়ার ভাটার কল্লোল এই পৃথিবীতে
শব্দে ও নৈঃশব্দ্যে কে মশগুল?
এই জলে কার চলাচল?
দূরালোকের গান ভাসে নিভৃতে!
পুঞ্জীভূত মেঘের আড়ালের ঘন নীল
আমাদের হৃদয়ের উচ্চতায় একেক আকাশ
হাওয়ায় এত ঘ্রাণ! কোন বনে ফুটেছে ফুল
কোথা হতে প্রজাপতি আসে ঠাঁই নাই একতিল!
গন্তব্য এক, দাঁড়িয়ে আছি আমরাও
প্রতীক্ষা শেষের ট্রেনে
উঠে পড়ি কে কোন কামরায়
এখন আর কেউ কাউকে চিনিনে!

গ্রাম

সোহেল রানা

এই ছায়া-মায়া-কায়া
ধুলোমাটি, ঘাস, শিশির–
দোয়েলের শিস, ঘাসের বুকে ফড়িং নিবিড়!
খালে-বিলে-ঝিলে–
আমি মাছরাঙা মন, হড়াই নদীর হাঁটুজলে
উড়ছি উড়ছি বাঁকে বাঁকে–
মাছ মাছ মাছ মাছ।
শারদ-সুন্দর কাশফুলের আকাশ!
ডানা মেলেছে সাদা-সাদা বকের পাল!
আর এখানে দখিনা বাতাস।
আর যদিও তুমি গাছ
এখানে তার অটুট বন্ধনে শিকড়।

সবুজের গাঁ

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম

যাবে ভাই? যাবে নাকি সবুজের গাঁয়?
ফসলের ক্ষেত দিয়ে হেঁটে খালি পায়?
চারদিকে সবুজের বিস্তৃত মাঠ,
অদূরেই বাড়িঘর আর আছে হাট।
পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ছোটো এক নদী,
তাতে বহু মাছ পাবে জাল ফেল যদি।
নদীটার বুক চিরে চলে ছোটো নাও
সাঁতরেও পার হয়, ছোটো শিশুরাও!
সবুজের গাঁয়ে আছে আরও বহু কিছু
নানাজাত ফলগাছ আম, জাম, লিচু।
মনোরম সবুজের গাঁয়ে চলো যাই
সবুজের গাঁয়ে গেলে মনে সুখ পাই।

শুভ্রতারই মেলা

এস ডি সুব্রত

শুভ্র আকাশে সাদা বক
উড়ে যায় বেশ
শরতে তাই মনে জাগে
অনন্য আবেশ।

শিউলি কাশ হাসনাহেনা
যেন সাদার খেলা
শরৎ এলেই বাংলাজুড়ে
বসে শুভ্রতারই মেলা।

পূজা এলো

নকুল শর্ম্মা

ঢাকের বাদ্যি ঐ শোনা যায়
এলো পূজার দিন,
কাশের দোলায় মন খুশিতে
নাচছে তা ধিন ধিন।

শিশির ঝরা শিউলি তলায়
জাগলো খুশির বান,
পাখির কণ্ঠে মধুর সুরে
আগমনী গান।

মা যে আসবেন কৈলাশ ছাড়ি,
রেখে ভোলা পতি,
সঙ্গে আসবেন কার্তিক গণেশ
লক্ষ্মী সরস্বতী।

খুশির জোয়ার বইছে দেখ
মায়ের বাপের ঘরে,
মর্ত্যধামে আসবেন আবার
একটি বছর পরে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের নিকট ২৪শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ বঙ্গভবনে প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেকের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল তথ্য কমিশন বাংলাদেশ-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ পেশ করেন– পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে তৃণমূলে সচেতনতা বাড়াতে হবে

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে দেশের তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে সচেতন করতে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেকের নেতৃত্বে তথ্য কমিশনের একটি প্রতিনিধিদল ২৪শে সেপ্টেম্বর বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ পেশ করতে গেলে তিনি এ নির্দেশনা দেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, তথ্য পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার। তথ্যের অবাধ প্রবাহ মানুষের কল্যাণ প্রসারিত করে এবং দুর্নীতিকে সংকুচিত করে। দুর্নীতি দমনে তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রয়োগের ওপর জোর দেন তিনি। তথ্য অধিকার আইন এবং এর যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণ যেন জানতে পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন রাষ্ট্রপতি। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ আরও বাড়াতে প্রশাসন, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করার কথা বলেন রাষ্ট্রপতি।

উন্নয়নে কোনো বিভাজন চলবে না

দেশের সার্বিক উন্নয়নে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে পাবনাবাসীসহ দেশের সব নাগরিককে একই ছায়াতলে এসে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। ফাউন্ডেশন আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি বলেন, উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনো বিভাজন চলবে না। দেশের উন্নয়নে ও জনগণের কল্যাণে দলমত নির্বিশেষে পাবনাবাসীসহ সবাইকে একই ছায়াতলে কাজ করতে হবে। গণমানুষের দাবি ও আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশ যেভাবে অগ্রগতির সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে এদেশ ২০৪১ সালে উন্নত দেশের পর্যায়ে পৌঁছাবে। পাবনার সার্বিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতার ছোঁয়া অবশ্যই পাবনাবাসীদের ওপর পড়বে এবং সেজন্য সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

পাবনা ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের সভাপতি বর্তমানে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। তিনি বলেন, ফাউন্ডেশন পাবনার উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে সে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠাকালীন থেকেই সবার

ছিল। আর তাই অনেক অসাধ্য কাজকে সাধন করা সম্ভব হয়েছে সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায়। তিনি আরও বলেন, পাবনা তথা দেশের উন্নয়নে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে

দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের দুর্নীতি এবং অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। ৩রা অক্টোবর রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২২' প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, দুর্নীতি ও অপকর্মের বিরুদ্ধে আপনাদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যে-কোনো পরিস্থিতিতে সরকার সবসময় আপনাদের পাশে থাকবে, উৎসাহ জোগাবে।

তিনি বলেন, দেশের শিল্পোন্নয়নে বিদ্যমান সব সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে সবার সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যেই উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব। মোঃ সাহাবুদ্দিন আরও বলেন, এরই মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সনাতনী থেকে ডিজিটাল কর্মসূচিতে পদার্পণের ছোঁয়া পরিলক্ষিত হয়েছে এবং ডিজিটাল থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট কর্মসূচিতে পদার্পণে বেশি সময় লাগবে না।

তিনি বলেন, বর্তমানে আমাদের স্লোগান হবে 'টেকসই শিল্পায়ন স্মার্ট বাংলাদেশের দর্শন'। রাষ্ট্রপতি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণে অবদান রাখারও তাগিদ দেন।

দেশে ব্যাবসা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ বিদ্যমান উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, শিল্প খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সরকার ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলেছে। কিন্তু একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর অতি মুনাফালোভী মনোভাব ও রাতারাতি বড়োলোক হওয়ার স্বপ্ন দেশের ব্যাবসাবাণিজ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলছে এবং এতে জনগণের ভোগান্তি বাড়ছে। অল্পকিছু লোকের অপকর্মের দায়ভার গোটা ব্যবসায়ী সমাজের হতে পারে না। শ্রমিকদের কল্যাণের পাশাপাশি দুস্থ ও মানবতার সেবায় দেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে ৬টি ক্যাটাগরিতে ভারী, মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির এবং উচ্চ প্রযুক্তির শিল্প ইউনিটের মালিকসহ ১২ জন শিল্পোদ্যোক্তাকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য 'বঙ্গবন্ধু শিল্প পুরস্কার ২০২২' সম্মাননা প্রদান করা হয়।

রাষ্ট্রপতি বলেন, শিল্প উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের জন্য এই পুরস্কার একটি অনন্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি যা তাদের টেকসই শিল্পায়নে বিনিয়োগ ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে উৎসাহ এবং প্রেরণা জোগাবে। তিনি আশা করেন, পুরস্কারপ্রাপ্তদের অনুসরণ করে অন্য ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও রপ্তানিকারকরা আগামী দিনে দেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রসারে উৎসাহিত হবেন।

প্রতিবেদন: মিতা খান

মুজিবের বায়োপিক বাংলাদেশের ইতিহাস তুলে ধরবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, *মুজিব: দ্য মেকিং অব এ নেশন* শিরোনামের বহুল প্রতীক্ষিত বায়োপিক দেখে জাতি অনেক অজানা তথ্য ও ইতিহাসের নতুন অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারবে। ১২ই অক্টোবর ২০২৩ আগারগাঁও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ-এ চলচ্চিত্রটির প্রিমিয়ার শো দেখার আগে প্রধানমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। এ সময় ছবিটি ১৩ই অক্টোবর সারা দেশের সিনেমা হলগুলোতে একযোগে মুক্তি পাবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি *মুজিব: একটি জাতির রূপকার* সিনেমাটির শুভ মুক্তি ঘোষণা করছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যার পর তাঁর নাম মুছে ফেলার বহু চেষ্টা করা হয়েছে। ইতিহাস কথা বলে। ইতিহাসকে (মুক্তিযুদ্ধের) বিকৃত করার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইতিহাসকে কখনো মুছে ফেলা যায় না।

ছবিটি বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছে। প্রখ্যাত ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্যাম বেনেগাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও রাজনৈতিক ঘটনাবলি চিত্রিত করে ছবিটি পরিচালনা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ, অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ ও প্রতিমন্ত্রীবৃন্দ।

দেশের টেকসই উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করুন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নবীন বিসিএস কর্মকর্তাদের '৪১-এর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার মূল সৈনিক' আখ্যায়িত করে দেশের অব্যাহত ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আপনাদের (নতুন বিসিএস কর্মকর্তাদের) সজাগ থাকতে হবে যাতে দেশের প্রতিটি উন্নয়ন অব্যাহত ও টেকসই হয়, যার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে। ৮ই অক্টোবর রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিসিএস কর্মকর্তাগণের ৭৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন ৫টি প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় নির্মিত ভবন এবং 'গভর্নমেন্ট এমপ্লয়মেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-জিইএমএস' সফ্টওয়্যার উদ্বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০৪১-এর বাংলাদেশের মূল কারিগর এবং সৈনিক হবেন আজকের কর্মকর্তারা। তখনতো আর আমরা থাকব না। কিন্তু দেশটা যেন এগিয়ে যায়। আমি শুধু সেটাই চাই।

প্রধানমন্ত্রী সিভিল সার্ভিসের নবীন কর্মকর্তাদের দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করার এবং এখানে লব্ধ প্রশিক্ষণকে দেশ ও জনগণের কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, যারা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই অক্টোবর ২০২৩ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবনে 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার' চলচ্চিত্রের প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন– পিআইডি

প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের সবাইকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। দেশের মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থাকতে হবে। কারণ তাদের রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, ঘাম ঝড়ানো যে উপার্জন সেই উপার্জনের টাকা দিয়েই আমাদের সবার সবকিছু চলে। একথাটা আমাদের ভুললে চলবে না।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, চাকরিটা শুধু চাকরি নয়, এটা দেশের সেবা করা। তাঁর সরকারের সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নে নজরদারির পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে যারা কাজ করবে তাদের মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণের কাজও করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারী ১৯টি ক্যাডার সার্ভিসের ৬০২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩০ জন কৃতি শিক্ষার্থীর হাতে 'মেধা সনদ' তুলে দেন এবং তিনজনের মাঝে 'মর্যাদা পদক' বিতরণ করেন।

শিশুদের মনে বড়ো হওয়ার স্বপ্ন ও সাহস জাগিয়ে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, শিশুদের মনে বড়ো হওয়ার স্বপ্ন ও সাহস জাগিয়ে দিতে সরকার সব সময় বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, সুশিক্ষা ও সুস্থ বিনোদন নিশ্চিত করার জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। ২রা অক্টোবর 'বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৩' উপলক্ষে এক বাণীতে তিনি বলেন, 'শিশুদের জন্য বিনিয়োগ করি, ভবিষ্যতের বিশ্ব গড়ি'– এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশের শিশুদেরকে জানাই আমার আন্তরিক স্নেহ ও ভালোবাসা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের অন্যতম অনুস্বাক্ষরকারী দেশ। জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৮৯ সালে শিশু অধিকার সনদ ঘোষণার ১৫ বছর পূর্বেই ১৯৭৪ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে বাংলাদেশে শিশু আইন প্রণীত হয়। তিনি বলেন, আমরা 'জাতীয় শিশুনীতি ২০১১', 'শিশু আইন ২০১৩', 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭' প্রণয়ন করেছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের শিশুরা বিশ্বের যে-কোনো উন্নত দেশের শিশুদের মতোই মেধাবী ও প্রজ্ঞাবান। তারা নানাবিধ প্রতিযোগিতা ও সৃজনশীল ক্ষেত্রে বিশ্বমঞ্চ থেকে সাফল্য ছিনিয়ে আনছে। আমাদের সরকার বাল্যবিবাহ নিরোধ, শিশুর সুষম বিকাশ সাধন ও সুরক্ষা প্রদানে সচেষ্ট রয়েছে। তবু শুধু সরকারি পদক্ষেপই এজন্য যথেষ্ট নয়। শিশুর যাবতীয় অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিতামাতা, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রসহ সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন একান্ত জরুরি। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক শিশুদের উন্নয়ন ও বিকাশের বিষয়ে সরকার সচেতন রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসহ সকল সচেতন নাগরিক ও অভিভাবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। আজকে যারা শিশু, তাদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হবে ২০৪১ সালের উন্নত-সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ'।

সরকার প্রবীণ নাগরিকদের প্রতি অত্যন্ত সংবেদন ও শ্রদ্ধাশীল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার প্রবীণ নাগরিকদের প্রতি অত্যন্ত সংবেদন ও শ্রদ্ধাশীল। প্রবীণ নাগরিকদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সুরক্ষার জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, তাদের পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। ১লা অক্টোবর 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে এ আহ্বান জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজকের প্রবীণ নাগরিকগণই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে লাল-সবুজের পতাকা অর্জন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রবীণ নাগরিকদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল। বাংলাদেশের সংবিধানে প্রবীণ নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে অসহায় প্রবীণদের জন্য সাংবিধানিক অঙ্গীকার তিনি সন্নিবেশিত করেন। তিনি বলেন, আমাদের সরকারই সর্বপ্রথম ১৯৯৬ সালে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তন করে। আমরা প্রতি উপজেলায় বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তিযোগ্য সকল প্রবীণ নাগরিককে পর্যায়ক্রমে এ কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ২০১৩ সালে সরকার জাতীয় প্রবীণ বিষয়ক নীতিমালা, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন প্রবর্তন করে। আমরা অবসরপ্রাপ্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের জন্য পেনশন সহজীকরণ, বৈশাখি ভাতা প্রদান, ইএফটি'র মাধ্যমে সরাসরি তাদের পাওনা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সম্প্রতি সরকারি চাকরিজীবীর বাইরে সর্বজনীন পেনশন ভাতা প্রবর্তন আমাদের সরকারের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে দেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠী নিরাপদ আর্থিক সমর্থন লাভের মাধ্যমে শেষ বয়সে পাবেন নিরাপত্তা ও সচ্ছল জীবনধারণের অনন্য সুযোগ।

খেলাধুলা সুস্থ সমাজ গঠনের অন্যতম অনুষঙ্গ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, খেলাধুলা সুস্থ সমাজ গঠনের অন্যতম অনুষঙ্গ। ক্রীড়ার ভেতর দিয়েই শিশুর সামাজিকীকরণ ঘটে। খেলাধুলার মাধ্যমেই ছাত্রছাত্রীরা সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, দলগত প্রচেষ্টা ও নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলি অর্জন করতে পারে। ২৬শে সেপ্টেম্বর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতি কর্তৃক আয়োজিত ৫০তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৩ উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা শেখ মুজিব নিজে খেলাধুলা করতেন। তাঁর পুত্র শেখ কামাল এবং পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ছিলেন জাতীয় পর্যায়ের পেশাদার খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংগঠক। ক্রীড়া ক্ষেত্রে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য জাতির পিতা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পথ অনুসরণ করে আমরাও পড়ালেখার পাশাপাশি ক্রীড়াকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি।

তিনি বলেন, মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে শারীরিক ও ক্রীড়া শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে শারীরিক ও মননগত বিকাশের মাধ্যমে সংবেদনশীল, যুক্তিনির্ভর ও পরোপকারী নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে সেজন্য স্কাউটিং এবং গার্লস গাইডকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ক্রীড়াকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ চলমান আছে। ক্রীড়া নিয়ে উচ্চশিক্ষার দ্বারও আমরা অবারিত রেখেছি। বিদ্যমান কিছু স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেছি এবং নতুন আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম তৈরি করছি।

প্রতিবেদনঃ প্রসেনজিৎ কুমার দে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ঃ বিশেষ প্রতিবেদন

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন। ৫ই অক্টোবর রাজধানীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ মিলনায়তনে বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০২৩ উপলক্ষে বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত 'ক্যাপিটাল মার্কেট ফর সাসটেইনেবল ফিন্যান্স' সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, আমাদের অর্থনীতির আকার বড়ো হয়েছে, বহুমাত্রিকতা এসেছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পাশাপাশি দেশে মানি মার্কেট এবং ক্যাপিটাল মার্কেট যদি একসাথে কাজ করে এবং মানি মার্কেট যদি ফড়িয়ামুক্ত হয় তাহলে দেশের সমৃদ্ধি আরও বৃদ্ধি পাবে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, আজকে পাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকার কারণে পাকিস্তান কিছু দিন আগ পর্যন্ত দেউলিয়া হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকার কারণে সেখানে কীভাবে জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। মানব উন্নয়ন সূচক থেকে শুরু করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য সূচকসহ সমস্ত সূচকে আমরা ২০১৪-২০১৫ সালেই পাকিস্তানকে অতিক্রম করেছি। এখানেই জননেত্রী শেখ হাসিনার দেশ পরিচালনার সার্থকতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর দেশ রচনার সার্থকতা। আজকে পাকিস্তান আমাদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

দেশের অর্থনীতির দিকে দৃকপাত করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, প্রকৃতপক্ষে আমাদের অর্থনীতির আকার গত প্রায় ১৫ বছরে কতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে সেটি অনেকের ধারণা নাই। আমাদের অতীতের একশো বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি এখন প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে উন্নীত হয়েছে অর্থাৎ প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি আমাদের বাজেট ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের ৮৮ হাজার কোটি টাকা থেকে এখন ১২ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৭ লাখ ৭৩ হাজার ৬৭৫ কোটি টাকা হয়েছে। মাথাপিছু আয় ২০০৮ সালে ছিল ৬০০ ডলার, এখন ২৮৫৯ ডলারে দাঁড়িয়েছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে তথ্য কমিশন ভবনে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দেশে যে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করেছে তার অপব্যবহার করে কেউ যেন সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে না পারে, সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজধানীর আগারগাঁওয়ে তথ্য কমিশন ভবনে 'তথ্যের অবাধ প্রবাহে ইন্টারনেটের গুরুত্ব' প্রতিপাদ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা নিজে এবং তাঁর সরকার অবাধ তথ্য প্রবাহে বিশ্বাস করে। অবাধ তথ্য প্রবাহ মানুষের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করে, গণতন্ত্র, বহুমাত্রিক সমাজ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংহত হয়। সে জন্য আমরা তথ্য অধিকার আইন পাস করেছি এবং আজকে সত্যিকার অর্থে দেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়েছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, গত এক দশকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেভাবে বিস্তৃত হয়েছে এবং হচ্ছে তাতে পৃথিবীর পুরো ক্যানভাসটাই বদলে গেছে, মানুষের অভ্যাসও বদলে গেছে। দেশে ৮ কোটির বেশি মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে এবং এই মাধ্যম আমাদের যোগাযোগের অবাধ সুযোগ যেমন করে দিয়েছে, একই সাথে রাষ্ট্রে অস্থিতিশীলতা, সমাজে অস্থিতিশীলতা, গুজব রটানো, ভুল সংবাদ, মিথ্যা সংবাদ, উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংবাদ ছড়ানোর বড়ো প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে।

প্রতি বছর ২৮শে সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিকভাবে তথ্য অধিকার দিবস পালনের ধারাবাহিকতায় এ দিনের সভায় বক্তারা বলেন, জাতীয় সংসদে ২০০৯ সালের প্রথম অধিবেশনে ২৯শে মার্চ তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার পর থেকে গত বছর অর্থাৎ ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে এ আইনের আওতায় ১৪৭৯১৮টি আবেদন জমা পড়েছে এবং এর ৯৬.৭৩ শতাংশ নিষ্পত্তি হয়েছে। আর তথ্য কমিশনে এ পর্যন্ত দায়ের করা ৫ হাজার ৩৬০টি অভিযোগের মধ্যে ৫২৭১টি নিষ্পত্তি হয়েছে। ২০০৯ সালে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল ৬০ লাখ যা এখন প্রায় ১২ কোটির কাছাকাছি এবং দেশে ব্যবহৃত মোবাইল সিমের সংখ্যা প্রায় ১৮ কোটি।

প্রীতিলতা, সূর্যসেন আজও দেশবিরোধীদের প্রতিরোধের অনুপ্রেরণা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ২৪শে সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অকুতোভয় বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ৯১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় তিনি বলেন, দেশবিরোধীদের প্রতিরোধে প্রীতিলতা, সূর্যসেনের মতো বিপ্লবীরা আজও আমাদের অনুপ্রেরণা।

১৯১১ সালের ৫ই মে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণকারী ও ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা থেকে স্বদেশভূমির স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গনকারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রথম বাঙালি শহিদ নারী যিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে আত্মাহুতি দিয়েছেন। অত্যন্ত মেধাবী প্রীতিলতা মেট্রিকুলেশন ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এরপর তিনি চট্টগ্রামে অপর্ণাচরণ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছিলেন, সেই স্কুল এখনও আছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আরও বলেন, সূর্যসেনের বিপ্লবী দলের সদস্য অসীম সাহসী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার যখন পুরুষের বেশে ইউরোপীয়ন ক্লাব সফলভাবে আক্রমণ করে ফিরে আসছিলেন, তখন তিনি গুলিবিদ্ধ হন। নির্যাতনের মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে ব্রিটিশ শত্রুপক্ষ বিদ্রোহের পরিকল্পনা যেন না জানতে পারে, সে জন্য তিনি পটাসিয়াম সায়ানাইড পান করে আত্মাহুতি দেন। ইতিহাসের দিকে দৃকপাত করে তিনি উল্লেখ করেন, প্রীতিলতার পরনের পোশাকে ৩২ পৃষ্ঠার একটি জবানবন্দি ছিল। তিনি সেখানে লিখেছিলেন যে, '...অত্যাচার ও স্বার্থসাধনে নিয়োজিত সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন করিয়া আমি ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করিতে ইচ্ছুক। আমি সেই ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার একজন সদস্য।...আমার দেশের ভগ্নীরা আজ নিজেকে দুর্বল মনে করেন না। সশস্ত্র ভারতীয় নারী হিসেবে সহস্র বিপদ ও বাধাকে তুচ্ছ করিয়া এই বিদ্রোহ আন্দোলনে যোগদান করিলাম। তাহার জন্য নিজেকে তৈয়ার করিলাম এবং এই আশা লইয়াই আমি আজ আত্মদানে নিজেকে উৎসর্গ করিলাম।'

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, তাঁরা যেভাবে দেশমাতৃকার জন্য জীবন দিয়েছে, উপমহাদেশের মুক্তিসংগ্রাম এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের এই আত্মদান বাঙালিদের প্রেরণা জুগিয়েছে, ভবিষ্যতেও জোগাবে। আজকে তাই সূর্যসেনের প্রতি, প্রীতিলতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাই।

শিশুপ্রতিভা বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যেতে পারে, আমরা সেই বাংলাদেশ রচনা করতে চাই। সেটি করার ক্ষেত্রে শিশুপ্রতিভা বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই ক্ষেত্রে শিশু চলচ্চিত্র উৎসব অনন্য ভূমিকা রাখছে। ৭ই সেপ্টেম্বর রাজধানীর সেগুনবাগিচায় শিল্পকলা একাডেমিতে চিল্ড্রেনস ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশ আয়োজিত ষোড়শ আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন। একাডেমি চত্বরে জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সূচনায় মন্ত্রীর সাথে অংশ নেন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা চলচ্চিত্র নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম এবং সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, আমাদের শিশুরা অনেক মেধাবী। তাদের সেই মেধাকে যদি বিকশিত করতে পারি তারা দেশ ও সমাজ গঠনে, উন্নত মানবিক জাতি গঠন ও বিশ্বব্যাপী শান্তি স্থাপনে বিরাট ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে শিশু চলচ্চিত্র উৎসব অনেক বড়ো ভূমিকা রাখে কারণ এখানে শিশুরা নিজেরাই ছোটো ছোটো চলচ্চিত্র বানায়, আজকে উপস্থাপকরাও ছিল শিশু। ১৬ বছর ধরে ধারাবাহিক এ উৎসব আয়োজকদের আমি ধন্যবাদ জানাই।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আরও বলেন, এখন প্রায় সব বয়সের মানুষই স্মার্টফোনে নিবদ্ধ হয়ে গেছে। এর ভালো দিক যেমন আছে অনেক খারাপ দিকও আছে। যে-কোনো কিছুতে আসক্তিই খারাপ। সেই আসক্তি থেকে শিশুদেরকে বের করে আনতে হবে। 'ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন'– স্লোগান নিয়ে তিনদিনব্যাপী এ উৎসবে শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা মিলনায়তন ও অলিয়ঁস ফ্রসেজ গ্যালারিতে ৩৯টি দেশের ১০১টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধি

নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৮দিন বাড়িয়ে ১২০ দিন করার বিধান রেখে 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০২৩'-এর খসড়ায় নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। ফলে এখন থেকে নারী শ্রমিকরা মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন ১২০ দিন, আগে ছিল ১১২ দিন। এই ছুটি নিজের সুবিধামতো নিতে হবে। ৯ই অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

বৈঠক শেষে সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, বর্তমানে নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ১১২ দিন। এখন ৮দিন বাড়িয়ে ১২০ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। নারী শ্রমিকরা তার সুবিধা মতো এ ছুটি নিতে পারবেন বলেও জানান তিনি।

ডিজিটাল ব্যাংক 'নগদ'

দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ব্যাংক হিসেবে অনুমোদনপত্র পেয়েছে মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা কোম্পানি নগদ। ২৫শে অক্টোবর গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের হাতে এ অনুমোদনপত্র তুলে দেন বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। এর আগে ২২শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পর্ষদ সভায় ৮ কোম্পানিকে ডিজিটাল ব্যাংক গঠনের প্রাথমিক অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

নগদ
ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন

নগদ জানায়, দেশে ডিজিটাল ব্যাংক সেবা চালুর লক্ষ্যে বছর তিনেক আগে তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে আবেদন করেছিল। এখন অনুমোদন পাওয়ায় ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা সাধারণ মানুষের দোড়গোড়ায় নিয়ে যেতে পারবে তারা।

নগদ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর এ মিশুক বলেন, সাধারণ মানুষ– যারা নানা কারণে ব্যাংকে আসতে বাধা অনুভব করেন, তাদের কাছেই সেবা নিয়ে হাজির হবে নগদ ডিজিটাল ব্যাংক। পদ্ধতিতে গ্রাহককে আর ব্যাংকে আসতে হবে না, বরং

ব্যাংকই মানুষের হাতে হাতে ঘুরবে। এর মধ্য দিয়ে দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধিতে আরেকটি উদাহরণ সৃষ্টি হবে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

নতুন প্রজন্মকে ইনোভেটিভ ও স্মার্ট হতে হবে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, একজন চাকরিজীবী সর্বোচ্চ একটা পরিবারের দায়িত্ব নেয় মাত্র, আর একজন উদ্যোক্তা অসংখ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। তাই নতুন প্রজন্মকে ইনোভেটিভ ও স্মার্ট হওয়ার পাশাপাশি উদ্যোক্তা হয়ে সমাজে ভূমিকা রাখতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শৈশব থেকে মা-বাবা কিংবা শিক্ষক সকলেই আমাদের অনুপ্রাণিত করেন পাবলিক সার্ভিস হোল্ডার বা ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হতে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মকে চাকরির পেছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। ১লা অক্টোবর চট্টগ্রাম নগরীর চট্টেশ্বরী রোডস্থ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন-এর মাহসা আমিনী ক্যাম্পাসের কনফারেন্স হলে স্টার্টআপ কম্পাস ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টিভেশন-এ আইসিটি প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ২০১০ সালে ছোটো আকারে যাত্রা শুরু করে বিকাশ ইনিশিয়েটিভ। মাত্র ১২ বছরের পথ চলায় বিকাশ এখন বিলিয়ন ডলারের কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। বিকাশের মাধ্যমে শুধু কম সময়ে ও নিরাপদে টাকা আদান-প্রদানের সুন্দর সমাধান হয়েছে তা নয়, এর বদৌলতে হাজারো লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, একটি মাত্র ইনোভেটিভ এবং ক্রিয়েটিভ সলিওশান কীভাবে বৃহত্তর সমস্যার সমাধান করার পাশাপাশি বিশাল একটা জনগোষ্ঠীর কর্মক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে বিকাশ তার উত্তম উদাহরণ। প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্টার্টআপ কম্পাসকে সফল করতে হলে ফান্ডিং, ট্রেনিং, ইনকিউবেশন এবং নেটওয়ার্কিং– এ ৪টি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। এরই মধ্যে আমরা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের কাজ শুরু করেছি। এ সময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জানান, বিশ্বের বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি যৌথ প্রচেষ্টা ও অর্থায়নের কারণে সফল হয়েছে। সুতরাং যৌথ প্রচেষ্টা ও অর্থায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্টার্টআপ বাংলাদেশ কোম্পানির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩০টি কোম্পানি বিনিয়োগ করেছে।

ডিজিটাল কানেক্টিভিটি টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে

জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, ব্রডব্যান্ড সংযুক্তির বিস্তার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। স্পিকার বলেন, দক্ষিণ এশীয় টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিলের প্ল্যাটফর্মে ডিজিটাল কানেক্টিভিটি বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ৩রা অক্টোবর রাজধানীর লা মেরিডিয়ান হোটেলে '২৪তম সাউথ এশিয়ান

টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরস কাউন্সিল (এসএটিআরসি)'-এর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে ইরানের আইসিটি উপমন্ত্রী ও ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের কমিউনিকেশন রেগুলেটরি অথরিটির প্রেসিডেন্ট আলী রেজা দারবেশীর সভাপতিত্বে এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিটির মহাসচিব মানাসুরি কুন্দ, বিশেষ অতিথি হিসেবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর শিকদার বক্তব্য রাখেন।

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে রাঙামাটির বেতবুনিয়ায় প্রথম ভূ-উপগ্রহ স্থাপনের মধ্য দিয়ে দেশকে ডিজিটাল সংযুক্তির স্বপ্ন দেখান। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের সদস্যপদ প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ব অঙ্গনে নিজের পরিচয় তুলে ধরে।

তিনি বলেন, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড-এর সুবিধা কাজে লাগাতে বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল সংযুক্তির মাধ্যমে হাইটেক পার্ক নির্মাণ ও তরুণদের জন্য ফ্রিল্যান্সিং সহজীকরণে কম্পিউটার ও বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করে আসছে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন টেকসই ডিজিটাল ভবিষ্যৎ, ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কে প্রবেশ ও গুণগত মান, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা, স্যাটেলাইট ও টেরিস্ট্রিয়াল সেবায় তরঙ্গ ব্যবহার এবং ৫জি প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক ও কর্মকৌশল নিয়ে কর্মপরিকল্পনা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল দক্ষতা বাড়াতে 'প্রজেক্ট খাদিজা'

বাংলাদেশের জাতীয় অ্যাপ স্টোর বিডিঅ্যাপস মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল দক্ষতা বাড়াতে 'প্রজেক্ট খাদিজা' নামে একটি উদ্যোগ চালু করেছে। মোবাইল ফোন অপারেটর রবি ও বিডিঅ্যাপস এ উদ্যোগ নিয়েছে। এ উদ্যোগের আওতায় সম্প্রতি রাজশাহী মহিলা ফাজিল মাদ্রাসায় প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ কর্মশালায় ৬০ জনেরও বেশি মাদ্রাসা শিক্ষার্থী বিডিঅ্যাপস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট ও এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনীয় ডিজিটাল দক্ষতা শেখার সুযোগ পেয়েছে।

প্রশিক্ষণের পর মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা বিডিঅ্যাপস প্ল্যাটফর্মে লাইট অ্যাপস তৈরি ও এর মাধ্যমে আয় করতে পারছেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২০ জন প্রথম মাসে গড়ে পাঁচ হাজার টাকা আয় করেছেন। সম্মিলিতভাবে আয়ের পরিমাণ এক লাখ টাকা।

মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল দক্ষতায় বৈষম্য দূর করতে চালু হওয়া 'প্রজেক্ট খাদিজা'র মাধ্যমে বর্তমানে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বিডিঅ্যাপসের মাধ্যমে কোডিং, গ্রাফিক্স ডিজাইনিং, স্পোকেন ইংলিশের মতো প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের তিন মাস ধরে পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি অর্জিত জ্ঞানের সঠিক ব্যবহারে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেওয়া হবে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতের সুপারিশ

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার সুপারিশ করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি। কমিটির বৈঠকে শিক্ষার্থীদের আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষকদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে তদারকি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৮ই অক্টোবর ২০২৩ জাতীয় সংসদ ভবনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান।

কমিটি সূত্র জানায়, বৈঠকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ২০২৪ সালে বিনামূল্যে পুস্তক প্রণয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতির ব্যাপারে আলোচনা হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাসময়ে বই দেওয়ার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ে সব বই উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছে যাবে বলে জানানো হয়।

গাছের চারা পেল নবীন শিক্ষার্থীরা

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে বসুন্ধরা শুভসংঘ দেশের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করে। এরই অংশ হিসেবে বসুন্ধরা শুভসংঘের গোপালগঞ্জ রিজেন্ট কলেজ শাখার উদ্যোগে ১০ই অক্টোবর ঐ কলেজের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া নবীন ২৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বনসাই, রঙ্গন, জুঁই, ঝাউসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রিজেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) দিপংকর মণ্ডল, প্রভাষক সাইদুর রহমান ও নীপা সুলতানা, শুভসংঘের রিজেন্ট কলেজ শাখার উপদেষ্টা ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা পর্শিয়া সুলতানা, আরেক উপদেষ্টা অমৃত বালা, সভাপতি নিউটন বালা, শুভসংঘের গোপালগঞ্জ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুজন দাস, সাংগঠনিক সম্পাদক তুর্জ রহমান প্রমুখ।

শুভসংঘের রিজেন্ট কলেজ শাখার উপদেষ্টা ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা পর্শিয়া সুলতানা সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, গাছের চারা হলো শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে বড়ো উপহার। প্রতিটি শিক্ষার্থী যদি

বছরে তিনটি করেও গাছের চারা রোপণ করে, তবে আমাদের দেশ সবুজে ভরে উঠবে। আরেক উপদেষ্টা অমৃত বালা বলেন, কলেজের নবীন শিক্ষার্থীদের বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করতেই তাদের গাছের চারা উপহার দেওয়া হয়েছে। গাছের চারা পেয়ে কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী সেতু বাইন বলেন, কলেজে এসে শুভসংঘের পক্ষ থেকে গাছের চারা উপহার পেলাম। এটি একটি ব্যতিক্রমী ও মহামূল্যবান উপহার।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

ব্রাউন ইউনিভার্সিটির বিশেষ সম্মাননা পেলেন শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন ইউনিভার্সিটি বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত করেছে। জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল তৈরির জন্য জাতিসংঘের স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে শেখ হাসিনাকে এই বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত করল ব্রাউন ইউনিভার্সিটি। ২০শে সেপ্টেম্বর বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ খবর প্রকাশিত হয়।

ব্রাউন ইউনিভার্সিটির স্বাস্থ্য বিষয়ক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ওয়ারেন অ্যালপার্ট মেডিকেল স্কুল অব ব্রাউন ইউনিভার্সিটির মেডিসিন অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের ডিন মুকেশ কে জৈন দ্য লোটে নিউইয়র্ক হোটেলে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশেষ এ সম্মাননার প্রশংসাপত্র হস্তান্তর করেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া প্রশংসাপত্রে বলা হয়েছে, জাতিসংঘ কর্তৃক শেখ হাসিনার উদ্যোগের (কমিউনিটি ক্লিনিক) সাম্প্রতিক স্বীকৃতির জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন। প্রশংসাপত্রে আরও বলা হয়, এটি কমিউনিটিভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার একটি সফল মডেল। এটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, নারীর ক্ষমতায়ন, কমিউনিটি সম্পৃক্ততা উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিধির জন্য একটি অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে মুকেশ কে জৈন জনস্বাস্থ্য ও গবেষণার ক্ষেত্রে জ্ঞান-অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি সম্ভাব্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বাংলাদেশ-ব্রাউন বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন ইনিশিয়েটিভ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সার্ভিক্যাল ক্যান্সারের পরীক্ষা করছে ব্রাউন ইউনিভার্সিটি। মুকেশ কে জৈন বলেন, তাঁরা ক্লিনিক থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী রোগীদের রেকর্ড রাখার জন্য বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিককে ইলেকট্রনিক ডেটা ম্যানেজমেন্ট চালু করতে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে পারেন।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতিসংঘ কমিউনিটি ক্লিনিককে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অনুকরণীয় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই উদ্যোগকে 'দ্য শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব মো. নূর এলাহি মিনা এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল জাতিসংঘের স্বীকৃতি পাওয়ায় তাঁকে বিশেষ সম্মাননা দিয়েছে ব্রাউন ইউনিভার্সিটির ওয়ারেন অ্যালপার্ট মেডিকেল স্কুল।

উল্লেখ্য, ব্রাউন ইউনিভার্সিটি গবেষণা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে একটি অংশীদারিত্ব গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এ লক্ষ্যে একটি চুক্তি সইয়ের ইচ্ছাও প্রকাশ করেছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি।

ইউবিএলের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন দুরদানা কবির

দেশের শীর্ষস্থানীয় নিত্যব্যবহার্য ও ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড (ইউবিএল)-এর হিউম্যান রিসোর্স ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সৈয়দা দুরদানা কবির। ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে এ নিয়োগ কার্যকর করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দুরদানা ইউনিলিভারের ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার এইচআর লিডারশিপ টিমে যোগ দেবেন।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার পাশাপাশি ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সৈয়দা দুরদানা কবিরের ২৫ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। ইউবিএলে যোগদানের আগে, ২০১৫ সালে প্রথম নারী এইচআর ডিরেক্টর হিসেবে দুরদানা নেসলে-এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি নেসলে-এর মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর এবং পরবর্তীতে মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলের ট্যালেন্ট অ্যান্ড অর্গানাইজেশন বিভাগের আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে কাজ করেন। দুরদানা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে তার বর্ণাঢ্য কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইএমবিএ সম্পন্ন করেছেন সৈয়দা দুরদানা কবির।

৯২ বছর বয়সে পড়াশোনা শুরু করলেন সালিমা খান

৯২ বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন ভারতের উত্তর প্রদেশের বুলান্দ শহরের বাসিন্দা সালিমা খান। এখন নিয়মিত ক্লাস করেন তিনি। এরই মধ্যে পড়তে ও লিখতে শিখে গেছেন। শুধু নিজেই পড়ছেন এমন নয়, তার সঙ্গে অন্যদের যোগ দিতেও উৎসাহ দিচ্ছেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর গণমাধ্যমের খবরের পাশাপাশি সেখানকার সরকারি কর্মকর্তারা এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

১৯৩১ সালের আশপাশে জন্ম সালিমা খানের। যখন তার বিয়ে হয় তখন তিনি ১৪ বছরের কিশোরী। সে সময় তার গ্রামে কোনো স্কুল ছিল না। কিন্তু তাঁর জীবনভর ইচ্ছা ছিল লেখাপড়া শিখবেন। সেই স্বপ্ন তার পূরণ হয়েছে। সালিমা খান এখন প্রমাতামহ (নানি বা দাদির মা)। তাঁকে স্কুলে নিয়ে যান তার নাতবউ। সালিমা স্কুলে যাওয়ার পর থেকে গ্রামের আরও ২৫ জন নারী গণশিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি হয়েছেন। তাদের মধ্যে তার দুই পুত্রবধূও রয়েছেন। সালিমা *টাইমস অব ইন্ডিয়াকে* বলেন, আমি মুদ্রার নোট চিনি না। সেই সুযোগে নাতি-নাতনিরা ভুল বুঝিয়ে আমার কাছ থেকে অনেক বেশি রুপি নিয়ে যেত। এখন আর সেই সুযোগ নেই। সেসব দিন এখন অতীত।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

৮ অর্থনীতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের পোশাকের কদর বেড়ে চলেছে ভারতে

বৈশ্বিক মন্দা আর মূল্যস্ফীতির প্রভাবে তৈরি পোশাক খাতের বড়ো বাজারগুলোতে কার্যাদেশ নিয়ে উদ্যোক্তাদের কিছুটা অস্বস্তি থাকলেও প্রতিবেশী দেশ ভারতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। সদ্যোবিদায়ি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ভারতে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে ১০১ কোটি ২৮ লাখ ডলারের। এই আয় এর আগের অর্থবছরের চেয়ে ৪১.৫৮ শতাংশ বেশি। এছাড়া চলতি অর্থবছরের জুলাইয়ে আয় হয়েছে সাত কোটি ৮৯ লাখ ডলার, প্রবৃদ্ধি ২.৬০ শতাংশ।

খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পণ্যের সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এজন্য বাংলাদেশ ও ভারত দুই দেশই কাছাকাছি উৎস থেকে পণ্য সংগ্রহের দিকে মনোযোগ বাড়িয়েছে। আবার বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অবকাঠামোগত যোগাযোগের উন্নতিও এ ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে।

বৈরী পরিবেশেও রপ্তানি আয়ে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি

বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ নানা প্রতিকূলতার পরও দেশের রপ্তানি আয়ে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই-আগস্ট) প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯.১২ শতাংশ। এ সময় আয় হয়েছে ৯৩৭ কোটি ৫১ লাখ মার্কিন ডলার। এর আগে সদ্যোবিদায়ি অর্থবছরে আয় ছিল পাঁচ হাজার ৫৫৬ কোটি ডলার, যা ছিল দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

রপ্তানি আয়ে এমন ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্যোক্তারা বলছেন বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের ওপর আস্থা বেড়েছে। কেননা এ সময় বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী চীন, ভারত ও ভিয়েতনামের মতো দেশগুলোর রপ্তানি ছিল নেতিবাচক।

তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতির মতে, জ্বালানির দর বৃদ্ধি ও কাস্টমস হয়রানি এবং বৈশ্বিক মন্দার কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়েও রপ্তানি আয়ে ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন দেশের উদ্যোক্তারা। এর ফলে নতুন বাজার তৈরি এবং উচ্চমূল্যের পোশাকের কদর বেড়েছে বিশ্বে। ফলে প্রতিযোগী দেশগুলোকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ এই মন্দায়ও ইতিবাচক রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে।

এদিকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) যে রপ্তানি পরিসংখ্যান দিয়েছে এতে দেখা যায়, চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই-আগস্ট) দেশের রপ্তানি আয় হয়েছে ৯৩৭ কোটি ৫১ লাখ মার্কিন ডলার। এ সময় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯.১২ শতাংশ। এই আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ০.২৬ শতাংশ বেশি।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই অক্টোবর ২০২৩ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (এইচএসআইএ) তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধন করেন। এই টার্মিনাল বিশ্বমানের যাত্রীসেবা এবং নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিমান চলাচল খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।

বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী, জাপানের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপমন্ত্রী মাসাহিরো কোমুরা, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন সচিব মোকাম্মেল হোসেন এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (সিএএবি) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম মফিদুর রহমান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। জাপানের ভূমি, অবকাঠামো, পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রী সাইতো তেতসু'ও এসময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী পরে টার্মিনাল-৩ পরিদর্শন করেন এবং এর বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন। এ সময় তাঁকে এর সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়। অনুষ্ঠানে তৃতীয় টার্মিনালের ওপর একটি ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয় এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের ওপর আরেকটি ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। তৃতীয় টার্মিনালটিতে অত্যন্ত পরিশীলিত মেঝে, পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলোসহ নজরকাড়া সিলিংয়ে সজ্জিত করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, তৃতীয় টার্মিনালের সম্পূর্ণ কার্যক্রম শেষ হওয়ার আগেই বিভিন্ন বিদেশি এয়ারলাইন্স ঢাকায় এইচএসআইএ থেকে তাদের কার্যক্রম শুরুর আগ্রহ প্রকাশ করেছে, যা দেশের বিমান চলাচল খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড়ো ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন এবং ক্যালিবারেশন সম্পন্ন হওয়ার পর তৃতীয় টার্মিনালটি আগামী বছরের শেষের দিকে যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণভাবে চালু হবে। এ টার্মিনাল পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হওয়ার পর ঢাকা বিমানবন্দরের বার্ষিক যাত্রী ও কার্গো হ্যান্ডলিং ক্ষমতা দ্বিগুণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তৃতীয় টার্মিনালটি একটি মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে যাত্রীরা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবেশ এবং প্রস্থান করতে সক্ষম হয়। নতুন টার্মিনালটি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ভূগর্ভস্থ রেলপথ (এমআরটি-৫, কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর অংশ) এবং একটি ভূগর্ভস্থ টানেলের মাধ্যমে বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনের সাথে সংযুক্ত হবে। এছাড়া, আশকোনা হজ ক্যাম্প থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলের মাধ্যমে হজযাত্রীরা তৃতীয় টার্মিনালে যেতে পারবেন।

ঢাকা-ভাঙ্গা রেল সার্ভিস উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই অক্টোবর ২০২৩ মুন্সিগঞ্জের মাওয়া রেলস্টেশনে এক নাগরিক সমাবেশে পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা ও যশোরের মধ্যে রেল যোগাযোগের ঢাকা-ভাঙ্গা অংশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ট্রেনে পদ্মা সেতু অতিক্রম করার স্বপ্ন আজ পূরণ হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ রেলওয়েকে আন্তঃএশীয় রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্য আমাদের রয়েছে। এ লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই অক্টোবর ২০২৩ ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ৩য় টার্মিনালের আংশিক উদ্বোধন করেন– পিআইডি

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই রেলরুটে বাণিজ্যিক ট্রেন চলাচল শুরু হবে। রেল সংযোগটি সম্পূর্ণ চালু হয়ে গেলে এটি ঢাকা থেকে যশোরের মধ্যে যাতায়াতের সময় অর্ধেক সাশ্রয় হবে এবং দেশের রেল যোগাযোগকে জোরদার করতে বড়ো ধরনের সহায়তা করবে।

রেলমন্ত্রী মো. নুরুল ইসলাম সুজনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দীন আহমেদ, স্থানীয় সংসদ সদস্য (মুন্সিগঞ্জ-২) সাগুফতা ইয়াসমীন এমিলি ও বাংলাদেশে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. হুমায়ুন কবির স্বাগত বক্তব্য রাখেন। রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. কামরুল আহসান এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা ও যশোরের মধ্যে রেল যোগাযোগের ওপর একটি ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

২০২২ সালের জুনে যুগান্তকারী পদ্মা সেতু উদ্বোধনের এক বছর দুই মাস পর পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা-ভাঙ্গা রেল সার্ভিস উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। গত বছরের ১৪ই অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী 'পদ্মা সেতু রেল সংযোগ নির্মাণ প্রকল্পের' আওতায় ঢাকা ও যশোরের মধ্যে রেল সংযোগ নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন। প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৯,২৪৬.৮০ কোটি টাকা। এর মধ্যে চীনের এক্সিম ব্যাংক ঋণ হিসেবে দিচ্ছে ২১,০৩৬.৭০ কোটি টাকা।

সমাপ্ত হওয়ার পর রেল যোগাযোগ পদ্মা সেতুর মাধ্যমে দেশের মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে রাজধানী শহরের যোগাযোগ উন্নত হবে এবং মুন্সিগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর এবং নড়াইল জেলার নতুন এলাকাকে যুক্ত করবে। প্রকল্পটি ঢাকা-যশোর-খুলনাকে ২১২.০৫ কিলোমিটার সংক্ষিপ্ত রুট দিয়ে বিকল্প রেলপথ সংযোগ স্থাপন করবে।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

সাড়ে ৫ কোটি টাকার কৃষি যন্ত্রপাতির চেক বিতরণ

খাগড়াছড়িতে পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং সাড়ে ৫ কোটি টাকার কৃষি যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন কর্মসূচির চেক বিতরণ করেন। মন্ত্রী ১লা অক্টোবর স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন চিটাগং হিল ট্রাক্টস (এস আইডি সিএইচটি) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রধান অতিথি হিসেবে এসব অর্থের চেক বিতরণ করেন। এর মধ্যে কৃষক ও বিভিন্ন কৃষক সমিতির মাঝে ৪ কোটি টাকার আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও উদ্যোক্তাদের মাঝে দেড় কোটি টাকার আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ করেছে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

এছাড়াও ৩৯১ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে প্রাণী সম্পদ, মৎস্য, মিশ্র ফল চাষাবাদ, তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়নসহ বিভিন্ন কর্মসূচির

আওতায় এক কোটি টাকা ও আপদকালীন ত্রাণ হিসেবে ১৪৬ জনকে ৫৭ লাখ টাকার চেক বিতরণ করা হয়।

মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গোপালগঞ্জের ৭৫০ কৃষক পাচ্ছেন বীজ-সার

মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলায় ৭৫০ কৃষক ও কৃষানি পচ্ছেন প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বীজ ও সার। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ খামারবাড়ির উপ-পরিচালক আ. কাদের সরদার এ তথ্য জানিয়েছেন। ওই কর্মকর্তা *বাসসকে* বলেন, খরিপ-২ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় ১৮০ জন কৃষক, মুকসুদপুর উপজেলায় ১৫৫ জন কৃষক, কাশিয়ানী উপজেলায় ১৫০ জন কৃষক, কোটালীপাড়া উপজেলায় ১৩৫ জন কৃষক ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় ১৩০ জন কৃষক প্রণোদনার বীজ-সার পাচ্ছেন।

প্রত্যেক কৃষককে ৫ কেজি করে মাসকলাই বীজ, ৫ কেজি এমওপি এবং ১০ কেজি ডিএপি সার বিনামূল্যে দেওয়া হবে। সেই হিসাবে ৩ হাজার ৭৫০ কেজি মাসকলাই বীজ, ৩ হাজার ৭৫০ কেজি এমওপি সার ও ৭ হাজার ৫০০ কেজি ডিএপি সার বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এসব সার বীজ বিতরণের জন্য উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রণোদনার এসব বীজ-সার বিতরণ শুরু হয়েছে। দ্রুত আমরা সব উপজেলায় এসব বীজ-সার বিতরণ সম্পন্ন করব। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাফরোজা আক্তার বলেন, মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় ১৮০ জন কৃষক ও কৃষানির মধ্যে প্রণোদনার বীজ-সার ১৭ই সেপ্টেম্বর বিতরণ করা হয়েছে। প্রত্যেক কৃষককে ৫ কেজি করে মাসকলাই বীজ, ৫ কেজি এমওপি এবং ১০ কেজি ডিএপি সার বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৮০ জন কৃষকের মধ্যে ৯০০ কেজি মাসকলাই বীজ, ৯০০ কেজি এমওপি সার ও ১ হাজার ৮০০ কেজি ডিএপি সার বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

গাজীপুরের বিরতুল ও গাড়ারিয়াকে নিরাপদ সবজির গ্রাম ঘোষণা

জেলার কালীগঞ্জ কৃষি অফিস উপজেলার নাগরী ইউনিয়নের বিরতুল ও গাড়ারিয়া গ্রামকে নিরাপদ সবজির গ্রাম ঘোষণা করেছে। গ্রাম দুটিতে চাষিরা কোনো প্রকার বালাইনাশক ছাড়াই বিভিন্ন কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সবজি চাষ করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে এখানে চাষ করা কাকরোলের বেশ চাহিদা রয়েছে। রাজধানীসহ দেশের আশপাশের বাজারগুলোর চাহিদা মিটিয়েও যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে।

কালীগঞ্জ উপজেলার নাগরী ইউনিয়নের বালু নদী তীরবর্তী গ্রাম বিরতুল ও গাড়ারিয়া। ঢাকার লাগোয়া এ উপজেলার গ্রাম দুটির নিরাপদ সবজির চাহিদা দেশজুড়ে। বিশেষ করে এ গ্রামে চাষ করা কাকরোল উৎপাদন আশপাশের গ্রামের চাষিদের অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। কাকরোল চাষে গ্রামগুলোর চাষিদের সফলতায় একই ইউনিয়নের বাগদী, পারওয়ান ও পানজোরা গ্রামের চাষিরাও বিষমুক্ত সবজি কাকরোল চাষ করছেন।

স্থানীয় কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, সেক্স ফেরোমান ফাঁদ, হলুদ স্টিকি ট্র্যাপ, হাত পরাগায়ন, আইপিএ প্রযুক্তি, ব্যাগিং, সুস্থ ও ভালো বীজ, সুষম সার, মালচিং, ভার্মি কম্পোস্ট এবং

জৈব বালাইনাশকের মাধ্যমে বিরতুল ও গাড়ারিয়া গ্রামে নিরাপদ সবজি কাকরোল চাষ হচ্ছে। দুই গ্রামসহ আশপাশের গ্রামের চাষ করা বিষমুক্ত সবজি কাকরোলের বেশ চাহিদা থাকায় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশেও পাঠানো হচ্ছে।

গোপালগঞ্জে ১৮০ কৃষক পেলেন প্রণোদনার বীজ ও সার

খরিপ-২ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় কৃষকদের মাঝে প্রণোদনার বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। ১৭ই সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স চত্বরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মহসিন উদ্দীন কৃষক ও কৃষানিদের হাতে প্রণোদনার বীজ ও সার তুলে দেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাফরোজা আক্তার বলেন, মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় ১৮০ জন কৃষক ও কৃষানির মধ্যে প্রণোদনার সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রত্যেক কৃষককে ৫ কেজি করে মাসকলাই বীজ, ৫ কেজি এমওপি এবং ১০ কেজি ডিএপি সার বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। এসব সার ও বীজ দিয়ে কৃষক ১৮০ বিঘা জমিতে মাসকলাই চাষাবাদ করবেন। এতে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা মাসকলাইয়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জলবায়ু তহবিলের অর্থ পেতে বদ্বীপ পরিকল্পনামাফিক প্রকল্প প্রণয়নের নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়সহ সংশিষ্টদের বদ্বীপ পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এমনভাবে প্রকল্প প্রণয়ন করতে বলেন, যাতে বাংলাদেশ জলবায়ু তহবিলের প্রতিশ্রুত ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থায়ন পায়। ১২ই সেপ্টেম্বর শেরেবাংলা নগর এনইসি সভাকক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় তিনি এ নির্দেশনা দেন। প্রধানমন্ত্রী সভায় সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকশেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান সাংবাদিকদের ব্রিফকালে বলেন, সম্প্রতি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে জলবায়ু তহবিলের ১ বিলিয়ন ডলার অর্থায়ন পাওয়ার বিষয়টি আলোচনা হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান, জলবায়ু তহবিলের অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুন্দরবনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু তহবিল থেকে বাংলাদেশের অর্থায়নের সর্বোচ্চ সীমা ১ বিলিয়ন ডলার। এ বিষয়ে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বলেন, জলবায়ু তহবিল থেকে বাংলাদেশের জন্য ইতোমধ্যে ১ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে দেশকে বাঁচাতে বদ্বীপ পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্পে অর্থায়ন করা হবে।

গত আগস্ট মাসে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়ে এম এ মান্নান বলেন, মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। তবে সরকারও এ বিষয়ে খুব সচেতন রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা অতীতের মতো এবারও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করব। আশা করছি, খুব শীঘ্রই আমরা ঘুঁরে দাঁড়াতে পারব। মুরগি ও ডিমের উচ্চ মূল্যের কারণে মূলত গত মাসে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে এবং সেটা অন্যান্য খাদ্যপণ্যকে প্রভাবিত করেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি হঠাৎ করে বৃদ্ধি পায়নি। বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং আবার ধীরে ধীরে হ্রাসও পায়। পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন, বিপুল অর্থনৈতিক বিপর্যয় পুনরুদ্ধারের প্রচেস্টায় শ্রীলঙ্কার মানুষ তাদের জীবনযাত্রার মান খুব সাধারণ পর্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে চলেছে। সুদের হার বাড়ানোর ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর এক উপদেষ্টার দেওয়া বক্তব্যের বিষয়ে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বলেন, সরকার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদের হার বাড়ানোর কথা ভাবতে পারে। তবে তিনি এও মনে করেন যে উচ্চ সুদহার বিনিয়োগের গতিকে মন্থর করতে পারে, যা প্রবৃদ্ধি হ্রাস করে থাকে।

সরকার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যাপকহারে টাকা ছাপাচ্ছে– এমন অভিযোগ নাকোচ করে শামসুল আলম বলেন, সরকারকে সাধারণত পুরানো ও ছেঁড়া নোট বদলের জন্য টাকা ছাপতে হয়। তিনি বলেন, সাধারণত আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি দেখা যায়। কারণ এই সময়ে দেশে বেশি বৃষ্টিপাত হয়, যার ফলে উৎপাদন ও সরবরাহ কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়। প্রতিমন্ত্রী বলেন, তবে, এ বছর বন্যার কারণে ফসলের তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। আশা করছি, নভেম্বর থেকে মূল্যস্ফীতি আবার কমতে শুরু করবে। কারণ সরবরাহ চেইনে তেমন কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি।

এক প্রশ্নের উত্তরে শামসুল আলম বলেন, সরকারের নীতিগত হস্তক্ষেপের কারণে বৈশ্বিক খারাপ পরিস্থিতি সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি দুই অঙ্কের মধ্যেই ছিল, তা না হলে- মূল্যস্ফীতি ১৩ থেকে ১৪ শতাংশে পৌঁছে যেত। তিনি বলেন, মূল্যস্ফীতি বাড়লে দ্রুত বেড়ে যায়, কিন্তু যখন কমতে শুরু করে, তখন মূল্যের অনমনীয়তা ফ্যাক্টর গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীলঙ্কার উদাহরণ তুলে ধরে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, শ্রীলঙ্কা নীতি সুদহার ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে অথচ তাদের প্রবৃদ্ধির হার নেতিবাচক। কিন্তু আমাদের প্রবৃদ্ধি যদি নেতিবাচক হয়, তাহলে অনেকেই চাকরি হারাবে। মোদ্দা বিষয়- শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক কাঠামো আমাদের থেকে আলাদা। মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরতে সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে শামসুল আলম বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকার চাল আমদানিতে শুল্ক ৬০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করেছে। নীতি সুদহার দু'দফা বাড়ানো হয়েছে এবং সুদহারের সীমা প্রত্যাহার করা হয়। পাশাপাশি সরবরাহ চেইন শক্তিশালী করতে সামগ্রিক ভর্তুকি বাড়ানো হয়েছে। তিনি বলেন, এছাড়া কৃষি ঋণের পুরোটা বিতরণ করা হয়েছে এবং টাকার অবমূল্যায়ন শেষ পর্যন্ত রপ্তানিকারকদের জন্য প্রণোদনা হিসেবে কাজ করছে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে পরিকল্পনা বিভাগের সচিব সত্যজিত কর্মকার বলেন, প্রকল্পের বিপরীতে উন্নয়ন সহযোগিদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ এবং সময়মত সেই ঋণ পরিশোধ করার পর্যাপ্ত সক্ষমতা বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের রয়েছে।

পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করায় একনেকের পক্ষ থেকে তাকে উষ্ণ অভিনন্দন জানানো হয়। তিনি বলেন, এবারের জি-২০ সম্মেলনে শেখ হাসিনার উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ বহির্বিশ্বে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং দেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়েছে। এম এ মান্নান বলেন, একনেক সভায় আরও উল্লেখ করা হয় যে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফর বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। এছাড়া, একনেক বৈঠকে ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) প্রতিবেদন সম্পর্কে অবহিত করা হয়, যেখানে বলা হয়েছে– বাংলাদেশ ২০৪০ সালের মধ্যে শীর্ষ ২০ অর্থনীতির দেশ হবে।

এর আগে একনেক বৈঠকে এম এ মান্নান প্রধানমন্ত্রীকে 'স্টেট অব দ্য ডেভলপমেন্ট: ইম্প্যাক্ট অব মেগা প্রজেক্টস' শীর্ষক একটি প্রকাশনা হস্তান্তর করেন। ডেভেলপমেন্ট জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ (ডিজেএফবি) প্রকাশনাটি সংকলন ও সম্পাদনা করেছে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহনশীল ঘর নিশ্চিত করছে সরকার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সারা দেশে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের জন্য জলবায়ু সহনশীল আবাসন নিশ্চিত করে আসছে। প্রধানমন্ত্রীর মহৎ উদ্যোগে ইতোমধ্যে দেশব্যাপী হাজার হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার ইটের তৈরি বাড়ি পেয়ে স্থায়ী ঠিকানা পেয়েছে। এ উদ্যোগটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। ৯ই অক্টোবর শহরের লালন শাহ উন্মুক্ত মঞ্চে 'বিশ্ব বাসস্থান দিবস ২০২৩' উপলক্ষে র‍্যালি-পরবর্তী আলোচনাসভায় বক্তৃতাকালে উন্নয়ন কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরা এ মন্তব্য করেন। এ বছরের দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো– 'টেকসই নগর অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারের চালিকা শক্তি।'

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (আরসিসি) এবং ব্র্যাক আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউডিপি) যৌথভাবে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের কীভাবে বাড়ি নিশ্চিত করা যায়– সে বিষয়ে আলোচনা ও উপায় উদ্ভাবন নিয়ে এই সভার আয়োজন করে। সভায় বলা হয়, নগরীর বিভিন্ন বস্তি এলাকায় বসবাসকারী ১২ সহস্রাধিক পরিবারের ৪৮ হাজার বাসিন্দা তাদের বহুমাত্রিক দারিদ্র্য ও বঞ্চনা নিরসনে ইউডিপি গৃহীত কর্মসূচির মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার উন্নতির সুযোগ পেয়েছে। এই উদ্যোগে ৪০টি সুফলভোগী পরিবার জলবায়ু সহনশীল ঘর পেয়েছে।

ব্র্যাক শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে, তাদের সামগ্রিক জীবন ও জীবিকার উন্নতি এবং মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন খাতের অংশীদারদের সম্পৃক্ত করতে আরসিসি'র সহযোগিতায় ইউডিপি বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

খাগড়াছড়ির প্রতিটি পূজা মন্দিরে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা উপহার

ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান ও খাগড়াছড়ির সাংসদ কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেন, প্রত্যেক ধর্মীয় উৎসবে একে অপরের সাথে দেখাদেখির মাধ্যমে মানুষের মাঝে মানবতার ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। ২১ ও ২২শে অক্টোবর খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়, মানিকছড়ি ও সিন্দুকছড়ি হয়ে দুর্গম লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা এবং ভারত সীমান্তবর্তী পানছড়ি উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা উপহার হস্তান্তর এবং পরিদর্শনকালে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, দুর্গাপূজার মাধ্যমে সমাজে নারী শক্তির উত্থান ও কল্যাণ কামনা করা হয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাও এ দেশের নারীসমাজ-মা-বোনদের জন্য নিরলস অবদান রেখে চলছেন।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা নয়, এটি এখন সর্বজনীন উৎসব। অশুভ শক্তি বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এখানে 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'– এ মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশে সব ধর্মীয় উৎসব একসঙ্গে পালন করা হয়।

টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেন, শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বীসহ পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসরত সকল নাগরিকের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করে, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ তথা জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার যে প্রত্যয় তা বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সহযোগিতা করার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ করছি।

এ সময়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মংসুইপ্রু চৌধুরী অপু, জেলা প্রশাসক মো. সহিদুজ্জামান, পুলিশ সুপার মুক্তা ধরসহ স্ব স্ব উপজেলার নির্বাহী অফিসার, উপজেলা পরিষদ ও ইউপি চেয়ারম্যান এবং থানার ভারপ্রাপ্তকর্মকর্তা (ওসি)সহ এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদনঃ মেজবাউল হক

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের ছবি নিয়ে ভারতে দুই চলচ্চিত্র উৎসব

শুধু বাংলাদেশের ছবি নিয়ে ভারতে অনুষ্ঠিত হয় দুটি উৎসব। ২১ থেকে ২৩শে অক্টোবর আগরতলায় 'দ্বিতীয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব' ও ২৩ থেকে ২৮শে অক্টোবর গুয়াহাটিতে 'প্রথম বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে প্রদর্শনীর জন্য প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের ৩৫টি চলচ্চিত্র বাছাই করা হয়। দুই উৎসবের জন্য প্রাথমিকভাবে বাছাই করা ৩৫টি চলচ্চিত্রগুলো হলো– *হাসিনা আ ডটার'স টেল*, *ছুঁয়ে দিলে মন*, *জালালের গল্প*, *অমি ও আইসক্রিমঅলা*, *অনিল বাগচীর একদিন*, *যদি একদিন*, *জিরো ডিগ্রী*, *বাপজানের বায়োস্কোপ*, *আয়নাবাজি*, *কৃষ্ণপক্ষ*, *তুখোড়*, *ভুবন মাঝি*, *সত্বা*, *রাজনীতি*, *ঢাকা অ্যাটাক*, *হালদা*, *অন্তর জ্বালা*, *আঁখি ও তার বন্ধুরা*, *গহীন বালুচর*, *পুত্র*, *পোড়ামন ২*, *দেবী*, *জান্নাত*, *ফাগুন হাওয়ায়*, *কালো মেঘের ভেলা*, *মনের মত মানুষ পাইলাম না*, *আবার বসন্ত*, *মায়া: দ্য লস্ট মাদার*, *গণ্ডি*, *ন ডরাই*, *বিশ্বসুন্দরী*, *গোর*, *গেরিলা*, *ঊনপঞ্চাশ বাতাস*, *রূপসা নদীর বাঁকে*।

গত পাঁচ বছরের মুক্তিপ্রাপ্ত এবং জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত ও বাইরের দেশের বিভিন্ন উৎসবে প্রশংসিত ছবির তালিকা পর্যালোচনা। এর পরে আরও একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করে সেই তালিকার ছবিগুলোই দুটি উৎসবে দেখানো হয়। এ ধরনের উৎসব আয়োজনের মধ্য দিয়ে ভারতের সিনেমাপ্রেমীরা বাংলাদেশের সিনেমা দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। আমাদের সিনেমা সম্পর্কেও ধারণা পাচ্ছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের জানার সুযোগ হচ্ছে।

বুসানে পুরস্কার জিতেছে বাংলাদেশের *বলী*

২৮তম বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের নিউ কারেন্টস বিভাগে পুরস্কার জিতেছে বাংলাদেশের সিনেমা *বলী* (*দ্য রেসলার*)। ১৩ই অক্টোবর উৎসবের সমাপনী দিনে এ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। মর্যাদাপূর্ণ এ চলচ্চিত্র উৎসবের নিউ কারেন্টস বিভাগে প্রথম বাংলাদেশি সিনেমা হিসেবে পুরস্কার জিতল *বলী*। নিউ কারেন্টস বিভাগে দুটি সিনেমাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। *বলী* ছাড়া এ বিভাগে পুরস্কার জিতেছে জাপানের মোরি তাতসুয়া পরিচালিত *সেপ্টেম্বর ১৯২৩* চলচ্চিত্রটি। দুই সিনেমাই পুরস্কার হিসেবে ৩০ হাজার ডলার পেয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করেন ইকবাল হোসাইন চৌধুরী।

সরকারি অনুদানের ছবি *বলী* (*দ্য রেসলার*)। ছবিটির প্রযোজক পিপলু আর খান। সহপ্রযোজক হিসেবে আছেন সাইফুল আজিম ও গাউসুল আলম শাওন। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান। সাগরপাড়ের এক ক্ষ্যাপাটে জেলের চরিত্রে দেখা যায় তাকে। চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী জব্বারের বলী খেলার প্রেক্ষাপটে নির্মিত *বলী*র গল্প। বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ৭, ৮ ও ৯ই অক্টোবর সিনেমাটির প্রদর্শন হয়।

উদীচীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

দুর্নীতিবিরোধী গীতি-কাব্য নাট্যালেখ্য, গান, নাচ, আবৃত্তি ও মিলনমেলার মধ্য দিয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনে ২৯শে অক্টোবর উদ্‌যাপিত হয় বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। সংস্কৃতির সংগ্রামে দ্রোহের দীপ্তি, মুক্তির লড়াইয়ে অজেয় শক্তি-স্লোগানে এবারের ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় বর্ণাঢ্যভাবে উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, বরেণ্য চিত্রশিল্পী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের সাবেক ডিন আবুল বারক আলভী। উদ্বোধন ঘোষণার পর গণসংগীত পরিবেশন করেন উদীচীর শিল্পীরা। এরপর অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে এবং ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। উদ্বোধন ঘোষণা, অতিথিদের বরণ এবং সম্মাননা প্রদানের পর ছিল সাবেক ও বর্তমান উদীচী কর্মীদের মিলনমেলা।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

জয় দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু বাংলাদেশের

ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে টাইগাররা। ফলে জয় দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করল বাংলাদেশ। ৭ই অক্টোবর ধর্মশালার হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন মাঠে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার জন্য আফগানদের আমন্ত্রণ জানায় বাংলাদেশ। টাইগার বোলারদের তোপে ধস নামে আফগান ব্যাটিং শিবিরে। ফলে ৩৭.২ ওভারে ১৫৬ রানে সব উইকেট হারিয়ে ফেলে আফগানিস্তান। ১৫৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নেমে ৩৪.৪ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৫৮ রান করে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ। ফলে ৬ উইকেটে জয় পেয়েছে সাকিব বাহিনী।

সেমিফাইনালে বাংলাদেশ

৪ই অক্টোবর এশিয়ান গেমস ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনালে মালয়েশিয়াকে নাটকীয় ২ রানে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে বাংলাদেশ। টস জিতে ব্যাটিংয়ে ২০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১১৬ রানে থামে বাংলাদেশের ইনিংস। জবাবে বিরেনদীপ সিংয়ের ৩৯ বলে চারটি ছয় ও তিনটি চারে ৫২ রান করে মালয়েশিয়াকে জয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। আফিফের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে মাত্র দুই রানের জয় পায় বাংলাদেশ। এর মাধ্যমে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে বাংলাদেশ।

১৯ বছর পর ঢাবিতে ক্রীড়াবিদদের জন্য কোটা চালু

এক সময় জাতীয় দলের ক্রীড়াবিদদের জন্য প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা ছিল। হঠাৎ করেই তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯ বছর পর ফের চালু হয়েছে সেই কোটা। চলতি ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই শুধু মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ভর্তি হতে পারবেন জাতীয় পর্যায়ে ভালো করা ক্রীড়াবিদরা।

১৪ই সেপ্টেম্বর মৌখিক পরীক্ষার আনুষ্ঠানিকতা শেষে জাতীয় দলের গোলকিপার আনিসুর রহমান ও ফরোয়ার্ড শেখ মোরসালিন– এ দুই ফুটবলারকে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের বিষয়ে ভর্তির জন্য সুপারিশ করা হবে বলে জানা গেছে।

রানার্সআপ বাংলাদেশ

সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ চ্যাম্পিয়নশিপে ১০ই সেপ্টেম্বর ভুটানের থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে ভারতের কাছে ০-২ গোলে হেরে রানার্সআপ হয়েছে বাংলাদেশ।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব

গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই

উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

না ফেরার দেশে কবি আসাদ চৌধুরী

আফরোজা রুমা

একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি আসাদ চৌধুরী চলে গেলেন না ফেরার দেশে। কানাডার টরেন্টোর আসোয়া লেকরিচ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৫ই অক্টোবর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ব্লাড ক্যান্সার, কিডনি জটিলতা, শ্বাসকষ্টসহ নানা বার্ধক্যজনিত জটিলতায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

১৯৪৩ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি বরিশালের মেহেদিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়ার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আসাদ চৌধুরী। তাঁর পিতার নাম আরিফ চৌধুরী ও মাতার নাম সৈয়দা মাহমুদা বেগম। আসাদ চৌধুরী আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬০ সালে তিনি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে ১৯৬৩ সালে স্নাতক (সম্মান) ও ১৯৬৪ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হবার পর আসাদ চৌধুরী ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে পেশা জীবনে প্রবেশ করেন। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত শিক্ষকতার পর সাংবাদিকতার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত তিনি ভয়েস অব জার্মানির বাংলাদেশ সংবাদদাতার দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘদিন বাংলা একাডেমিতে চাকরি করে তিনি প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

কবি আসাদ চৌধুরী একাধারে ছিলেন অনুবাদক, প্রাবন্ধিক, গবেষক, শিশু সাহিত্যিক, আবৃত্তিকার ও উপস্থাপক। তাঁর প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থগুলো হচ্ছে– তবক দেওয়া পান (১৯৭৫), বিত্ত নাই বেসাত নাই (১৯৭৬), প্রশ্ন নেই উত্তরে পাহাড় (১৯৭৬), জলের মধ্যে লেখাজোখা (১৯৮২), যে পারে পারুক (১৯৮৩), মধ্য মাঠ থেকে (১৯৮৪), মেঘের জুলুম পাখির জুলুম (১৯৮৫) প্রভৃতি।

শিশুসাহিত্যের বইগুলো হচ্ছে– রাজার নতুন জামা (রূপান্তর, ১৯৭৯), রাজা বাদশার গল্প (১৯৮০), গ্রামবাংলার গল্প (১৯৮০), ছোট্ট রাজপুত্র (অনুবাদ : ১৯৮২), গর্ব আমার অনেক কিছুর (১৯৯৬), ভিন দেশের মজার লোককাহিনী (১৯৯৯), তিন রসরাজের আড্ডা (১৯৯৯), কেশবতী রাজকন্যা (২০০০), গ্রামবাংলার আরো গল্প (২০০০), তোমাদের প্রিয় চার শিল্পী (জীবনী, ২০০০), জন হেনরি (আমেরিকার লোককাহিনী, ২০০১), মিকালেঞ্জেনো (জীবনী, ২০০১), ছোটদের মজার গল্প (২০০১), সোনার খড়ম (২০০৬), মুচি-ভূতের গল্প (২০০৬)।

জীবনীগ্রন্থ– সংগ্রামী নায়ক বঙ্গবন্ধু (১৯৮৩), রজনীকান্ত সেন (১৯৮৯), স্মৃতিসত্তায় যুগলবন্দী (২০০১)। ইতিহাসগ্রন্থ– বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (১৯৮৩)। অনুবাদগ্রন্থ– বাড়ির কাছে আরশিনগর : বাংলাদেশের উর্দু কবিতা (২০০০) প্রভৃতি।

কবি আসাদ চৌধুরী দেশে-বিদেশে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। পুরস্কার ও সম্মাননাগুলো হলো– আবুল হাসান স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৫), অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮৭), শম্ভুগঞ্জ এনায়েতপুরী স্বর্ণপদক (১৯৯৯), ত্রিভুজ সাহিত্য পুরস্কার, বরিশাল বিভাগীয় স্বর্ণপদক, অশ্বিনী কুমার পদক (২০০১), জীবনানন্দ দাশ পদক, অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক, জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার (২০০৬), বঙ্গবন্ধু সম্মাননা ১৪১৮, একুশে পদক (২০১৩), শব্দভূমি আজীবন সাহিত্য সম্মাননা (২০১৮)।

কবি আসাদ চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৬ই অক্টোবর ইসমালিক ফাউন্ডেশন অব টরেন্টো জামে মসজিদে জানাজা শেষে অন্টারিওর ডাফিন মিডোস কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। আমরা তার আত্মার শান্তি কামনা করছি।

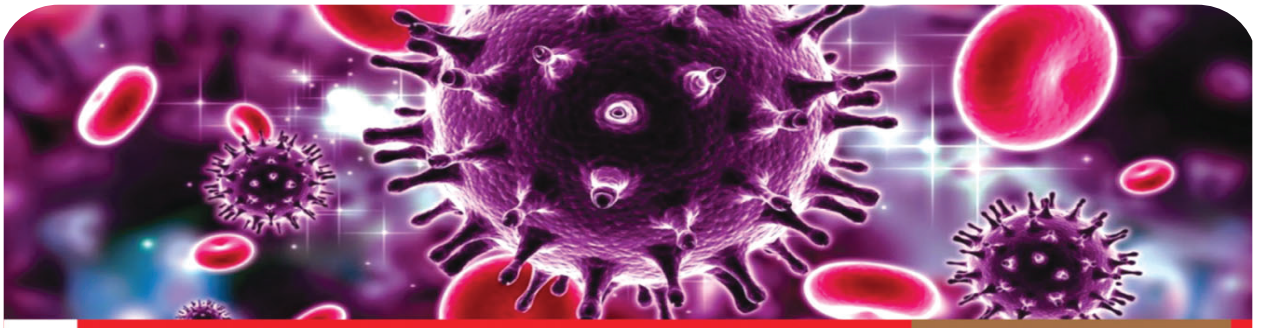

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- হঠাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 44, No. 04, October 2023, Tk. 25.00

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই অক্টোবর ২০২৩ মুন্সিগঞ্জের মাওয়া রেলওয়ে স্টেশন প্রান্তে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সুধী সমাবেশে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd